দক্ষিণেশ্বরের গেঁয়ো ৭৮/০.৮৮

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী

তারিখ নির্দ্দেশক পত্র

পনের দিনের মধ্যে বইখানি ফেরৎ দিতে হবে।

পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ
465	[illegible]	[illegible]	770	5/11/85	18/11
86	11/9/73	16/9	963	17/3	
510	29/9	13/10	372	18/5	
568	8/9	15/9	372	12/7	
732	[illegible]	16/8	31	28/6	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	958	16/2/97	
784	[illegible]	[illegible]	958	27.2.97	
[illegible]	16/1	29/1	958	14.3.97	
[illegible]	6/3	[illegible]			
866	26/8	[illegible]			
761	13/11	14/11			
815	28/4	[illegible]			
[illegible]	6/6/83				

পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহ[illegible] তা[illegible]

দশাবতার চরিত।

শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

সন ১৩৩৩ সাল।

শ্রাবণ

প্রাপ্তিস্থান

উদ্বোধন কার্য্যালয়

১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

ও

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, শ্রীহট্ট।

মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

প্রকাশক
ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ
উদ্বোধন কার্য্যালয়
১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার
৭১।১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১০৬৩।২৫

পূর্ব্বাভাষ।

শ্রীমদ্‌ ভাগবতাদিগ্রন্থে মৎস্যকূর্ম্মাদি বহু অবতারের বিষয় উল্লেখ আছে। কিন্তু দশাবতার-বাদ কখন প্রচলিত হয় তাহা জানা যায় না। জয়দেবের সময়, সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে এই মতবাদ সুপরিচিত ছিল। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার 'অভিব্যক্তিবাদ' গ্রন্থে প্রথম পঞ্চ অবতার সম্বন্ধে একটি চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, ভূতত্ত্ব আলোচনা করিলে অভিব্যক্তির ইতিহাসে মৎস্য হইতে বামন পর্য্যন্ত একটি আশ্চর্য্য ক্রম দৃষ্ট হয়।

পরশুরাম প্রভৃতি চারিজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, ইহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুধর্ম্মের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ইঁহাদের জীবনে পাওয়া যায়।

কল্কি সম্বন্ধে মহাপুরুষগণ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। এই সূত্র অবলম্বনে কোনও রসিক পুরুষ কল্কি পুরাণ নামক একখানা উদ্‌ভট কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইহার কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকিতে পারে না।

উপন্যাস পাঠ করিয়া সাহিত্য-রসিকগণ যেমন আনন্দ ও উপদেশ লাভ করেন, পৌরাণিক গল্পগুলি তেমনি ভক্তদের প্রীতি ও শিক্ষাপ্রদ। উভয়ের আনন্দ ও শিক্ষা ঐতিহাসিকতার উপর নির্ভর করে না।

আমার বহু দিনের সংকল্পিত অবতার-চরিত্র চিত্রগুলি ভক্তদের করে প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইলাম। ইতি

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
শ্রীহট্ট
১লা আশ্বিন, ১৩৩২ বাং

বিনীত
গ্রন্থকার—

দশাবতার চরিত।

প্রথম ভাগ।

মৎস্য চরিত।

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিতবহিত্র-চরিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃত-মীন শরীর
জয় জগদীশ হরে॥

১

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, সমুদয় জগৎ সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বশেষে মানবের আদিপুরুষ মনুকে সৃষ্টি করেন। মনুর সন্তান বলিয়া আমাদের নাম মানব। মানবই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব।

সন্তানের জন্য মনু কঠোর তপস্যা করেন। তপস্যার গুণে, তাঁহার খুব তেজস্বী অনেক সন্তান জন্মিল। তাহারা নানা বিদ্যা আবিষ্কার করিল, তপস্যা করিয়া মহাশক্তি লাভ করিল, ফলে,—জীবজগতের প্রভু হইয়া প্রকৃতি

রাজ্যের সকল প্রকার সুখসুবিধা ভোগ করিতে লাগিল। মনুর মনে আনন্দের আর সীমা রহিল না।

নিশ্চিন্ত হইয়া মনু তপস্যায় মগ্ন হইলেন। ধ্যান যোগে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, যখন কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল, তখন তিনি জানিতে পারিলেন, কিছুদিন পরে সমস্ত পৃথিবী একেবারে জলমগ্ন হইয়া যাইবে। কাজেকাজেই সমুদয় জীব ধ্বংস হইবে। তাঁহার এত তপস্যার ফল সমূলে বিনষ্ট হইবে ভাবিয়া মনু বড়ই দুঃখিত হইয়া পড়িলেন। এই চিন্তা তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। তপস্যার ফলে জগৎ সৃষ্টি; তপস্যার দ্বারাই তাহা রক্ষা করিতে হইবে, এই ভাবিয়া তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। এক গিরিগুহায়, শিলাসনে বসিয়া ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার বাহিরের জ্ঞান একেবারে লোপ হইল। শরীর কাঠের পুতুলের মত নিশ্চল হইয়া রহিল। মন ব্রহ্মা-ময় হইয়া গেল। ব্রহ্মা এই উগ্র তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন।

ব্রহ্মা বলিলেন, "বৎস, তোমার সন্তান সন্ততিতে পৃথিবী পূর্ণ। তাহারা সর্ব্ববিধ ভোগের বস্তু পাইয়া আনন্দে আছে। তবে কেন আর তুমি এমন কঠোর তপস্যা করিয়া শরীর পাত করিতেছ?" মনু তাঁহার মনের ভাব ব্রহ্মাকে নিবেদন করিলে ব্রহ্মা বলিলেন,

"বৎস, তুমি এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত হও। যাঁহার ইচ্ছায় আমি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি, যাঁহার ইচ্ছায় তুমি মানুষের আদিপুরুষ, সেই প্রেমময় নারায়ণ তাঁহার জীবরক্ষা করিবার সুব্যবস্থা করিয়াছেন।" এই বলিয়া তিনি মনুর মনশ্চক্ষুর সম্মুখে সেই ভবিষ্যৎ ঘটনার দৃশ্য উদঘাটিত করিলেন। মনু প্রফুল্ল হইয়া ব্রহ্মার চরণে প্রণত হইলে ব্রহ্মা অদৃশ্য হইলেন।

কত পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া জগৎ চলিতে লাগিল। ধনধান্যে পৃথিবী পূর্ণ; রূপ, যৌবন, স্বাস্থ্য,—তাহার পাশে জরা ব্যাধি মরণ; তুচ্ছ বিষয় লইয়া কলহ বিবাদ, ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য রক্তপাত; আবার স্নেহপ্রেম, পরার্থে আত্ম-ত্যাগ, এমনি সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দের আবর্ত্তনে মানব জীবনে কত বিচিত্র ভাব ফুটিয়া উঠিল। মানুষ, প্রকৃতির বিধানে কালের স্রোতে ছুটিয়া চলিল।

ভোগে মানুষের মন ক্রমে মত্ত হইয়া উঠিল। শরীরের আরাম ছাড়িয়া মন অন্তরের শান্তির সন্ধান করিতে চাহিল না। নিন্দা বিদ্বেষ ক্রমে কলহ ও হিংসায় পরিণত হইল, তারপর হত্যা রক্তপাত অত্যাচার আরম্ভ হইল। মিথ্যা, ছলনা, মানব-হৃদয়ে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিল।

সাধুদের লাঞ্ছনার একশেষ, দুর্ব্বলের কাতর রোদন শ্রীহরির আসন টলাইল।

সুষমাময়ী প্রকৃতির হাসিমুখে প্রচণ্ড ক্রোধের প্রকাশ দেখা দিল। শরতের নির্ম্মল গগনে অশনি-নিনাদ, বসন্তের মলয় মারুতে প্রবল পবনের উচ্ছ্বাস, ঘোর ঋতুবিপর্য্যয় উপস্থিত হইল। দুর্ভিক্ষ মহামারী নির্দ্দয়ভাবে জীবগণকে গ্রাস করিতে লাগিল। আত্মরক্ষার কোন উপায় রহিল না। মহা উৎকণ্ঠায় মানুষের দিন কাটিতে লাগিল।

৩

সেই সময় পৃথিবীতে দ্রাবিড় নামে এক রাজ্য ছিল। সেই রাজ্যের রাজা ছিলেন পরম ধর্ম্ম পরায়ণ সত্যব্রত। প্রজার মঙ্গলই ছিল তাহার একমাত্র চিন্তা। যাগ যজ্ঞ ধ্যান জপেই তাঁহার দিন কাটিত। মানব জাতির দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইয়া তিনি অহরহ ভগবানের নিকট জগতের কল্যাণ প্রার্থনা করিতেন।

একদিন সত্যব্রত পুকুরের জলে পিতৃতর্পণ করিতে-ছিলেন। সহসা একটি পুঁটিমাছ, নাচিতে নাচিতে, তাঁহার অঞ্জলি মধ্যে আসিয়া পড়িল। মাছটাকে তিনি ছুঁড়িয়া ফেলিতে উদ্যত হইলে মাছ মানব ভাষায় ক্ষীণ-

স্বরে, "রক্ষা কর, রক্ষা কর" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। রাজা চমকিত হইয়া মাছটাকে হাতে তুলিয়া দেখিতে লাগিলেন। মাছ আবার বলিল, "আমি বড় বড় মাছের ভয়ে বড় ভীত হয়েছি। তুমি আমায় রক্ষা কর।" রাজা ত একেবারে অবাক! মাছটাকে তিনি কমণ্ডলুতে রাখিয়া তর্পণ শেষ করিলেন। পরে কমণ্ডলুটি বাড়ীতে আনিয়া চুপ্ চাপ্ একস্থানে রাখিয়া দিলেন। রাজা ভাবিলেন, ভগবানের ইচ্ছায় এমন একটা ঘটনা ঘটা অসম্ভব কিছু নয়। হয় ত ইহাতে তাঁহার কোন নিগূঢ় অভিপ্রায় আছে। ভক্তগণ এমনি সকল কাজে স্থিরচিত্তে ভগবানের মুখ চাহিয়া থাকেন।

পরদিন সকালে রাজা কমণ্ডলুতে মাছের অবস্থা দেখিতে গেলেন। মাছটা কমণ্ডলু পূরিয়া রহিয়াছে এবং তাঁহাকে দেখিয়া বলিতেছে, "রাজা, দেখ আমি কত বড় হয়েছি। তোমার এ ছোট কমণ্ডলুতে আর ধরে না। আমাকে সত্বর তুমি আরও বড় জায়গায় রাখ।" রাজা তাহাকে একটি চৌবাচ্চার জলে রাখিলেন।

পরদিন রাজা দেখিলেন মাছটা আশ্চর্য্যরূপে এমন বাড়িয়া গিয়াছে যে, চৌবাচ্চায় নড়িবার স্থানও আর নাই। এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া রাজা ভগবানের কথা ভাবিতে লাগিলেন। সাধারণ লোকের ন্যায় চঞ্চল হইয়া

উঠিলেন না। মাছ, রাজাকে মোটা গলায় আরও বড় জলাশয়ে রাখিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। রাজা উদ্যানের বৃহৎ সরোবরে মাছটিকে রাখিয়া ভাবিলেন, এইবার মাছের আর কোনও দুঃখ রহিল না।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, পরদিন রাজা দেখিলেন মাছ সমস্ত পুকুর জুড়িয়া রহিয়াছে। লোকে বলে, "গণ্ডূষ জলমাত্রেণ সফরী ফরফরায়তে।" কিন্তু এ সফরী বৃহৎ সরোবরে নড়িতে চড়িতে অক্ষম, ফরফরাণ দূরের কথা। এ ঘটনা জানিতে আর কাহারও বাকী রহিল না। মাছের আওয়াজও অসম্ভব মোটা হইয়াছে। সেই মোটা গলায় সে রাজার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিল।

রাজা সেনাপতিকে আদেশ দিলেন, 'মাছকে কষ্ট না দিয়া নদীতে ফেলিতে হইবে।' সেনাপতি পর্ব্বত প্রমাণ রশি মাছের গায়ে জড়াইয়া সহস্র সহস্র লোক ও কতক-গুলি হাতীর সাহায্যে একশত গরুর গাড়ীর উপর মাছকে তুলিয়া বহুকষ্টে নদীতে লইয়া গেলেন। এই কাহিনী মুখে মুখে সহস্ররূপে রঞ্জিত, অতিরঞ্জিত হইয়া ভারতময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। রোগ, শোক, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, উল্কাপাত, বজ্রাঘাতে পৃথিবীর ভয়ানক অবস্থা; এই ঘটনায় আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। যে মুষ্টিমেয় লোক এত বিপদ ঠেলিয়া বাঁচিয়াছিল, এই ঘটনায়—ভয়ে

তাহারা মৃতবৎ হইয়া গেল। রাজা সত্যব্রত ভগবানের চিন্তায় বিভোর হইয়া রহিলেন।

মাছের দেহ কিন্তু নদীতেও ভয়ানকরূপে বর্দ্ধিত হইয়া স্রোত রুদ্ধ করিল। তীরের গ্রাম সমূহ ভাসিয়া গেল। দ্রাবিড় রাজ্যে হাহাকার উপস্থিত হইল। মৃতাবশিষ্ট ভয়ে অর্দ্ধমৃত লোকের সাহায্যে মাছকে টানিয়া সাগরে লইয়া যাওয়া হইল। মাছ সাগরে গিয়া মনের সাধে অঙ্গ বিস্তার করিয়া এক মহাদেশের আকার ধারণ করিল।

রাজা মাছকে ভগবান বোধে স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন, "হে শ্রীহরি, তুমি ব্যতীত এমন অদ্ভুত লীলা করিতে পারে, আর এমন কে আছে? পাপে রত মানুষ তোমাকে ভুলিয়া অহঙ্কারে মত্ত হইয়াছিল। তাহাদের যথেষ্ট দণ্ড হইয়াছে; এখন তুমি প্রসন্ন হও। যে মানুষ ধরাকে সরা দেখিত, আজ তাহারা মাছের ভয়েও ভীত। তুমি তুচ্ছ মাছের রূপ ধরিয়া দাম্ভিক মানুষের দর্প পূর্ণরূপেই চূর্ণ করিয়াছ। এখন প্রসন্ন হও।"

তখন সহসা চারিদিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মৎস্যের পূর্ব্বার্দ্ধ নারায়ণরূপে পরিণত হইল। পদ্মফুলের পাপড়ির মত চোখ দুটি, প্রসন্ন হাস্যময় মুখ, যাহা দেখিবামাত্র

জগৎ ভুল হইয়া যায়; চারি হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা আর পদ্ম। সেই প্রেমের দেহ দর্শনে রাজার শরীর রোমাঞ্চিত হইল, কাঁপিতে কাঁপিতে ঘাম ঝরিতে লাগিল, অশ্রুতে শরীর ভিজিয়া গেল, তাহার বুক ফাটিয়া কান্না আসিল। তিনি কথা বলিতে পারিতেছিলেন না; এক আনন্দের ঢেউ যেন তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া বহিয়া যাইতেছিল। নারায়ণ রাজার মাথায়, মুখে, বুকে হাত বুলাইয়া তাঁহাকে শান্ত করিয়া কহিলেন, "বাবা সত্যব্রত, একবার পূর্ব্ব জন্মের কথা স্মরণ কর। তুমি মানুষের আদি পুরুষ মনু। প্রলয়-প্লাবনকালে মানব জাতির রক্ষার জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলে। ব্রহ্মার বরে তোমাদ্বারা মানবসহ সমগ্র জীব জগতের রক্ষা হইবে।" রাজার মনে একে একে পূর্ব্বজন্মের সকল কাহিনী জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

শ্রীহরি বলিলেন, "আর সাতদিন পরে প্রলয়কাল উপস্থিত হইবে। তুমি মানবাদি জীবের এক একটি দম্পতি ও উদ্ভিদ্ সমূহের বীজ সত্বর সংগ্রহ করিয়া রাখ। সাতদিন পরে দেবতা-নির্ম্মিত একখানা সোনার নৌকা তোমার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইবে। তুমি জীব-দম্পতি ও উদ্ভিদ্-বীজ সহ তাহাতে আরোহণ করিও। যখন প্রলয় পবনে সাগর উচ্ছ্বসিত হইয়া পৃথিবীকে গ্রাস

করিবে, তখন আমি শৃঙ্গধারী স্বর্ণমৎস্যরূপে আবার আবির্ভূত হইব। তোমার সোনার তরী আমার শৃঙ্গে বাঁধিয়া রাখিও। মাভৈঃ মাভৈঃ" কথাটি শেষ হইতে না হইতে স্বপ্নের মত নারায়ণ-মৎস্য অন্তর্হিত হইলেন।

সাতদিন পরে, সত্য সত্যই একখানা স্বর্ণতরণী আসিল। রাজা, শ্রীহরির আজ্ঞানুসারে জীব-দম্পতি ও উদ্ভিদ্-বীজসহ তাহাতে আরোহণ করিলে নৌকা আপনি আপনি সমুদ্রের মধ্যস্থলে চলিয়া গেল।

তখন পৃথিবীতে ভয়ানক ঘটনাবলী ঘটিতে লাগিল। সূর্য্যের তেজ বারগুণ বাড়িয়া গেল। পুকুর হ্রদ নদী সব শুকাইল। লতাপাতা গাছপালা কিছুই রহিল না। পক্ষী সব আগে মরিল, তারপর অন্যান্য জীবজন্তু মরিয়া নিঃশেষ হইল। মানুষ নানা উপায়ে বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সবই বৃথা হইতে লাগিল। যে সব দুর্ভাগা হাড় কয়েকখানা লইয়া বাঁচিয়া রহিল, তাহারা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পাগল হইয়া শৃগাল শকুনির ন্যায় ঘৃণিত-ভাবে পচা মড়া লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে লাগিল। তবুও যাহারা মরিল না, তাহারা উলঙ্গ উন্মত্ত পিশাচ হইতেও জঘন্য ভাবে পশু হইতেও হিংস্র হইয়া উঠিল। রক্তপানে তৃষ্ণা মিটাইতে একে অন্যকে হত্যা করিল। জনকয়েক মিলিয়া একজনকে মারিয়া রক্ত মাংস খাইতে

লাগিল। এইরূপে মানব জাতি নির্ম্মূল হইল। অট্টালিকা, নগর, গ্রাম শূন্য পড়িয়া রহিল, জগৎ নীরব নিঃস্তব্ধ। তীব্র দ্বাদশ সূর্য্যের তেজ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, আর বাতাস যেন হু হু করিয়া শোক প্রকাশ করিতেছে।

পৃথিবীতে জীবনের চিহ্নমাত্র নাই। অসংখ্য জীব জন্তুর শুষ্ক মৃতদেহ ও শুষ্ক বৃক্ষলতায় পৃথিবীপৃষ্ঠ আবৃত। একদিন দাবানল জ্বলিয়া উঠিল এবং প্রচণ্ড রৌদ্র ও পবনের সহায়তায় ক্রমে সমগ্র পৃথিবীপৃষ্ঠে সঞ্চালিত হইয়া পৃথিবীকে এক অগ্নিগোলকে পরিণত করিল। কী ভীষণ দৃশ্য !

জ্বলিয়া জ্বলিয়া ইন্ধনসহ অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল ; ধরাতল ভস্মে আচ্ছাদিত হইয়া রহিল। বাধাহীন প্রবল পবন ভীষণ গর্জ্জনে পৃথিবীপৃষ্ঠে আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, ভস্ম ও ধূলিরাশি গায়ে মাখিয়া সূর্য্যকিরণ রুদ্ধ করিল।

তীব্র রবি কিরণে নদ নদী হ্রদের জলরাশি বাষ্প হইয়া আকাশে সঞ্চিত ছিল। মেঘে পরিণত হইয়া তাহা এখন পৃথিবীকে ঘেরিয়া রহিল। দিবা রাত্রির ভেদ ঘুচিয়া গেল। শত শত স্তরে বিন্যস্ত মেঘরাশির ভীষণ গর্জ্জন এক মেরু হইতে অন্য মেরু পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। ভূমিকম্পে ধরাতল মুহুর্ম্মুহু কম্পিত

হওয়াতে পর্ব্বত সকল ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল, নদীগর্ভে পর্ব্বত মাথা তুলিল, সাগর মরুভূমিতে পরিণত হইল।

তারপর মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। বর্ষণ ও শিলাপাতে বন্ধুর ভূমি সমূহ সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হইল; বড় বড় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া জলস্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল সমস্ত পৃথিবী জলে জলময়, পাহাড়-পর্ব্বত সমতল-সাগর সব একাকার হইয়া পড়িল। উন্মত্ত প্রলয়-পবনে পর্ব্বত প্রমাণ তরঙ্গরাশি ঊর্দ্ধে আকাশে উত্থিত হইয়া শত বজ্র নির্ঘোষে একে অন্যের গায়ে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। প্রলয় যেন মূর্ত্তিমান হইয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে বিচরণ করিতে লাগিল।

রাজা সত্যব্রতের সোনার তরী যখন উত্তাল তরঙ্গে আকাশ পাতাল করিতেছিল, তখন তিনি ভীত হইয়া নারায়ণকে ডাকিতে লাগিলেন। নারায়ণ বহুযোজন-ব্যাপী স্বর্ণবর্ণ শৃঙ্গধারী মৎস্যরূপে সাগরজলে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার অঙ্গের জ্যোতিঃ চারিদিক আলোকিত করিল। রাজা নির্ভয়ে তাহার সোনার তরী শ্রীহরির শৃঙ্গে বন্ধন করিয়া নিরাপদ হইলেন।

বর্ষণ করিয়া করিয়া মেঘ নিঃশেষ হইল। নির্ম্মল আকাশে সূর্য্যোদয় হইলে ধরাতলে জল বই আর কিছুই দৃষ্ট হইল না। পবন স্থির, জল তরঙ্গহীন। সূর্য্যকিরণে

পৃথিবী একটি কাচ গোলকের ন্যায় চকমক করিতে লাগিল। মনুর সোনার তরীতে জীবগণ আশ্বস্ত হইল।

নিস্তরঙ্গ সাগরজলে চন্দ্র সূর্য্যের রঙ্গের খেলা দেখিয়া দ্রাবিড়েশ্বর সৌন্দর্য্যাধার শ্রীহরির চিন্তায় মগ্ন হইলেন। ঊর্দ্ধে নির্ম্মল নীল অনন্ত গগন, নিম্নে দিগন্ত বিস্তৃত নীল সাগর তাঁহার মনে ভগবানের অনন্ত ভাবরাশি জাগাইয়া দিল। তিনি যেন এক আনন্দলোকে চির মঙ্গল মধ্যে বিহার করিতেছেন বলিয়া বোধ করিলেন।

মৎস্যরূপী নারায়ণ, ভবিষ্য-মানবের ধর্ম্মবিষয়ে মনুকে বহুবর্ষ ধরিয়া শিক্ষা দিলেন। অধর্ম্ম বিনাশ ও ধর্ম্ম স্থাপনের জন্যই প্রয়োজন অনুসারে তিনি নানারূপ ধরিয়া থাকেন।

ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর ভূভাগ ভাসিয়া উঠিল। রাজা সত্যব্রত তাহাতে উদ্ভিদের বীজ ছড়াইয়া দিলেন। প্লাবনান্তে ধরণী, অত্যন্ত উর্ব্বরা বলিয়া অল্প দিনেই ফল-ফুলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মনু জীবগণসহ ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। দেখিতে দেখিতে পৃথিবী আবার জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

কূৰ্ম্ম চরিত।

ক্ষিতিরতি বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরণিধরণ-কিণচক্রগরিষ্ঠে।
কেশব ধৃত কূৰ্ম্ম শরীর
জয় জগদীশ হরে।

১

এক সময় স্বর্গের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া দেবগণের বড় গর্ব্ব হয়। ভোগ বিলাসে মত্ত হইয়া তাঁহারা সকল প্রকার তপস্যা পরিত্যাগ করিলেন। ক্রমে আলস্য, তাহার ফলে শরীর মনের দুর্ব্বলতা আসিয়া দেবতেজ নষ্ট করিল। রহিল কেবল পূর্ব্ব গৌরবের দম্ভ এবং কে বড় কে ছোট এই লইয়া অহরহ কলহ।

অপর দিকে পাতালবাসী অসুরগণের উদ্যমের অন্ত নাই। শাস্ত্র পাঠ, দান, ধ্যান, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি সকল কাজেই তাহাদের সমান উৎসাহ। দেখিতে দেখিতে তাহারা মহা শক্তিমান হইয়া উঠিল। দেবগণের দুর্ব্বলতা তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। একদিন দাম্ভিক দেবগণ দেখিলেন, অসংখ্য অসুরসেনা কর্ত্তৃক স্বর্গরাজ্য আক্রান্ত।

যখন ভোগে ও আত্মকলহে তাঁহারা ব্যস্ত ছিলেন, তখন অসুরগণ ধনে জনে, বল বুদ্ধিতে তাঁহাদিগকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। অবশ্য দেবগণ অতি জাঁক জমকের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, এবং দেবতার বাণে অসুরগণ অচিরে যে ধ্বংস হইয়া যাইবে এ বিষয়ে অকাট্য যুক্তি সমূহ পরস্পরে আলোচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ফলে দাঁড়াইল অন্যরূপ। দেবতার বাণ যতই তীক্ষ্ণ হউক না কেন, তাহা ক্ষেপণ করিতে যে বলের প্রয়োজন, দেবদেহে তাহার অভাব। অসুরগণের দেহ বজ্রবৎ দৃঢ়। তাহারা দেহের কষ্ট, মৃত্যুভয় অগ্রাহ্য করিয়া দেবসৈন্যের ভিতর দলে দলে প্রবেশ করিতে লাগিল। তাহাদের 'মার মার' 'কাট কাট' রব, ভীষণ হুহুঙ্কার, আত্মরক্ষার চেষ্টা না করিয়া উভয় হাতে নির্ভীকভাবে তলোয়ার চালনা দেবতাদের মহা আতঙ্কের সঞ্চার করিল। দেবতারা দৈত্যতেজ সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না; পরাস্ত হইয়া স্বর্গ ত্যাগ করিয়া পলাইলেন। অসুরগণ স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া বসিল।

অসুরদের ভয়নাক অস্ত্রাঘাত সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যু যে সুখকর তাহাতে সন্দেহ নাই, এমনি তাহাদের দারুণ প্রহার! দেবগণ ছিন্ন ভিন্ন দেহ লইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের পর্ব্বতগুহা প্রভৃতিতে অতি কষ্টে

যে যেখানে পারিলেন লুকাইয়া রহিলেন। ঘটনাচক্রে কেহ কেহ দৈত্যদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া ঘোরতর লাঞ্ছনা ও প্রহার সহ্য করিলেন। দেবতাদের উদ্ধারের কোন উপায়ই রহিল না। অনন্তকাল অসুরগণের প্রহার অপমান সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকা ছাড়া দেবগণের কি গতি আছে? অহঙ্কার ও অলসতার ফল কী বিষময় !!

প্রজাপতি ব্রহ্মা দেবতাদের দুঃখে বড়ই ব্যথিত হইলেন। অসুরগণ যতই ভাল কাজ দান ধ্যান করুক না কেন, তাহাদের উদ্দেশ্য নাম, যশ, ইহলোকের ভোগ। নাম যশের জন্য, ভোগের জন্য, ইহারা সব করিতে পারে; কিন্তু ভগবান বা ধর্ম্মের দিকে তাহাদের মন মোটেই নাই। যে টুকু ধর্ম্ম তাহাদের মধ্যে দেখা যায়, তাহা কেবল স্বার্থ সাধনের উপায় মাত্র। ভগবানকে তাহারা চাহে না, চাহে ভগবানের কাছে সুখ, সুবিধা। আর দেবতারা একটা সাময়িক দুর্ব্বলতার জন্য দাম্ভিক হইয়া উঠিলেও ভগবানকে ভালবাসেন, ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্ম সাধন করেন। সময় সময়, তাঁহাদের মনে ভোগের ভাব প্রবল হইয়া নানা দুর্ব্বলতা আনিলেও তাঁহাদের মূল স্বভাবটি ভাল।

অসুর স্বর্গের রাজা হইয়া অসুর-বিধান মতেই রাজ্য

শাসন করিতে লাগিল। ধার্ম্মিক ও জ্ঞানীর মান রহিল না। ধনবল, দেহবল, বাহ্য সৌন্দর্য্যের গৌরব অতি-মাত্রায় বাড়িয়া গেল। বিচার তাহাদের খাম-খেয়ালি মাত্র, 'খাই খাই' 'চাই চাই' হইল সভ্যতা; তাড়াহুড়ি, হুলুস্থূল ও হুজুগে দেশ মাতিয়া উঠিল। স্বার্থের জন্য মিথ্যা অবলম্বন হইল নিত্যকর্ম্ম। সংসারে ঘোরতর আসক্ত হইয়া মানুষের মন বাসনা অনলে দগ্ধ হইতে লাগিল।

প্রজাপতি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে বাহির করিলেন, এবং তাঁহাকে লইয়া বৈকুণ্ঠপতি শ্রীহরির নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীহরি অবশ্য ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সবই জানেন। দেবগণের দুর্দ্দশা, অসুরের স্বর্গ বিজয়, কিছুই তাঁহার অবিদিত ছিল না, তথাপি ব্রহ্মা ও ইন্দ্র তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে, তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ইন্দ্র লজ্জায় মাথা তুলিতে পারিতেছিলেন না; ব্রহ্মাই সব কথা শ্রীহরির নিকট নিবেদন করিলেন।

শ্রীহরি দেবতাদের কষ্টে সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন; এবং বলিলেন তাঁহাকে আরও আগে জানাইলেই ভাল হইত। ইন্দ্রকে নানা কথা বলিয়া তিনি উৎসাহিত করিলেন। তিনি বলিলেন, "দেবরাজ, উত্থান পতন

লইয়াই এই জীবন। দেহ ধারীর পক্ষে জয় হোক, বা পরাজয় হোক, কর্ম্ম করা ছাড়া আর উপায় নাই। কর্ম্মের ফলেই দেবগণের দুর্দ্দশা এবং কর্ম্মই দৈত্যগণের উত্থানের কারণ। কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্ম ক্ষয় করিতে হইবে। তবে যাহা তাহা একটা কর্ম্ম করিলেই হয় না; সুপরামর্শ প্রয়োজন। তোমরা যে পরামর্শ লইতে আসিয়াছ, ইহাতেই দেবগণের উত্থানের বীজ নিহিত আছে। যে ঠিক কাজ করিতে চায়, সে খাঁটি লোকের পরামর্শ মতই চলে। তুমি যখন আমার নিকট আসিয়াছ, তখনই তোমার বিপদ কাটিয়া গিয়াছে, জানিবে। আমি চিরকালই আমার শরণাগতের রক্ষা করিয়া থাকি।

"আমি কর্ম্মফল দাতা; অসুরগণ যে কাজ করিয়াছে, সে কাজের ফলভোগে বাধা দিবার সাধ্য কাহারও নাই। এখন তোমাদিগকে কঠোর কর্ম্মের দ্বারা তাহাদের কর্ম্মকে পরাজিত করিতে হইবে। এখন যুদ্ধ করিয়া দৈত্যবিজয় দেবতাদের সাধ্য নহে। কাজেই তুমি গিয়া তাহাদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন কর। দেবাসুরে মিলিয়া ক্ষীরোদ সাগর মন্থন কর, তাহাতে অমৃত উঠিবে; অমৃত পান করিয়া তোমরা অমর হইবে, অশেষ তেজ লাভ করিবে, দৈত্য জয়ের ক্ষমতা হইবে।"

কাজটা সোজা নহে। প্রথম, পরাজিত পলায়িত

ইন্দ্রের পক্ষে দৈত্য রাজের নিকট সন্ধি ভিক্ষা, একটা সাগর মন্থন করা, তারপর অমৃত পাওয়া গেলে অসুরকেও ত তার ভাগ দিতে হইবে। অসুরগণ অমৃত পানে অমর হইয়া গেলে ত দেবতাদের সকল আশাই নির্ম্মূল। কিন্তু, শ্রীভগবানের বাক্যে ইন্দ্রের এমন বিশ্বাস যে, তাঁহার মনে কোন সন্দেহের উদয় হইল না। ইহাকেই বলে দেব-হৃদয়। ইন্দ্র জানেন, শ্রীবিষ্ণু হইতে বেশী হিতৈষী আর কেহই নাই। ইহাই ত ভক্তের লক্ষণ।

৩

সুররাজের সিংহাসনে বসিয়া অসুররাজ ত্রিলোক শাসন করিতেছেন। আর দেবরাজ রাজ্যহীন, মানহীন, নিরস্ত্র, দৈত্যপতির নিকট সন্ধিপ্রার্থী। ইন্দ্রের অপূর্ব্ব মুখশ্রী, উজ্জ্বল কান্তি, এবং সিংহসম নির্ভীক পাদবিক্ষেপ দর্শনে দৌবারিকগণ সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল। ইন্দ্র, সভায় প্রবেশ করিয়া দৈত্যরাজকে রাজোচিত সম্ভ্রম প্রদর্শন করতঃ নিজ পরিচয় দিলেন।

দৈত্যগণ, এতকাল ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া দূর হইতে দেবগণকে বিশেষতঃ ইন্দ্রকে দেখিয়াছে। আজ তাহাদের সভাস্থলে আসিয়া ইন্দ্র অপূর্ব্ব অঙ্গ কান্তিতে দৈত্য-সভাকে ম্লান করিয়া দিয়াছেন। দৈত্যগণ, সত্য সত্যই

স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার দিকে সসম্ভ্রমে চাহিয়া রহিয়াছে। সত্য সত্যই তাহাদের মনে হইতেছিল, এই সিংহাসনে এমন ব্যক্তি বসিলেই মানায় ভাল। দৈত্যপতিও চিরকাল যে ইন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিয়াছেন, পাতালে থাকিয়া যে ইন্দ্রের স্বর্গভোগ স্বপ্নরাজ্যের কল্পনা বলিয়া ভাবিয়াছেন, আজ সেই ইন্দ্র বিনীতভাবে সিংহাসনের নিম্নে! তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন। ইন্দ্র এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"দৈত্যরাজ, ঈর্ষাবশে আমরা বহুকাল শত্রুতা করিলেও দৈত্য ও আদিত্য একই পিতার সন্তান, স্বর্গ-সিংহাসনে আপনার ও আমার সমান অধিকার। দেব-দৈত্যগণের আমিও ভাই আপনিও ভাই। সিংহাসন লইয়া এই কাড়াকাড়ি, ভাই এর সঙ্গে ভাই এর কলহ বড়ই লজ্জার কথা। গৃহ বিবাদে শত্রুর বলবৃদ্ধি। মিলিত থাকিলে কশ্যপ সন্তানগণ পিতৃগৌরব রক্ষা করিতে অসমর্থ নহে। আমি সিংহাসনের জন্য আর লালায়িত নহি। দৈত্য ও আদিত্যগণের মঙ্গলের জন্য, এই ঘৃণিত ভ্রাতৃকলহ নিবারণের জন্য আমি আপনার নিকট সন্ধি প্রার্থী।"

'গোঁয়ার-গোবিন্দলোক বড় মিঠাকথার বশ। বিশেষতঃ কেহ তাহাদের শরণ লইলে তাহারা সত্য সত্যই

গলিয়া যায়। অসুরগণ ইন্দ্রের এই মধুর প্রেমের ভাষা শুনিয়া একেবারে গলিয়া গেল। দৈত্যপতি নিজ সিংহাসনের পার্শ্বে ইন্দ্রকে বসাইয়া সম্মান দেখাইলেন।

ইন্দ্র বলিলেন, "আমি বৈকুণ্ঠে, নারায়ণের নিকট গিয়াছিলাম। তিনি বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া ভাইএ ভাইএ মিলিত হইয়া ক্ষীরোদ সাগর মন্থন করিবার পরামর্শ দিলেন। মন্থনে অমৃত উদ্‌ভূত হইবে। অমৃতের গুণের কথা কাহারও অবিদিত নহে।"

দৈত্যরাজ এই অসম্ভব প্রস্তাব শুনিয়া আনন্দে মাতিয়া উঠিলেন। সভাস্থ দৈত্যগণ অমৃতের নামে হৈ হৈ রৈ রৈ করিয়া উঠিল। অসুরপ্রধানগণ অতি কষ্টে তাহাদিগকে থামাইলেন। সকলে সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইল। ইন্দ্রকেই সমুদ্র মন্থনের নেতৃত্ব প্রদান করা হইল। ইন্দ্র সব যোগাড় যন্ত্র করিতে চলিয়া গেলেন।

৪

সুরপতি সমুদয় দেবগণকে বহুসন্ধানে সমবেত করিলেন। সভাস্থলে, শ্রীবিষ্ণুর পরামর্শ অনুসারে তিনি যাহা যাহা করিয়াছেন, দেবগণের নিকট তাহা বিবৃত করিলেন; এবং সমুদ্র মন্থন বিষয়ে পরামর্শ চাহিলেন। দেবগণ মন্থন-দণ্ড ও রজ্জুর সন্ধানে বাহির হইলেন। জগতের

যাবতীয় পর্ব্বতকে ‍ন দণ্ড হইতে অনুরোধ করা হইল; কিন্তু কেহই এই গুরুতর কার্য্যে অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। অবশেষে পাষাণকায় মন্দরগিরি এ কার্য্যে ব্রতী হইল। সর্প ও নাগগণের মধ্যে বাসুকী, অমৃতের লোভে মরণ পণ করিয়া মন্থন-রজ্জু হইতে সম্মতি দিলেন।

শুভদিনে, দেবাসুর বাহিনী, মহা উৎসাহে, মন্দরগিরি উৎপাটন করতঃ ক্ষীরোদ সাগরে লইয়া চলিলেন। কিন্তু হায়, কিছুদূর যাইতে না যাইতে তাহারা এমন ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন যে, সাগর পর্য্যন্ত পর্ব্বত বহন করা সম্ভব কিনা, সকলের মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইল। দেবরাজ লজ্জায় একেবারে ম্রিয়মান হইয়া গেলেন। দেবগণ কাতরভাবে শ্রীহরিকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। সহসা, বিশাল মেঘখণ্ডের ন্যায় আকাশে গরুড়ের আবির্ভাব হইল। তদুপরি জগন্নাথ শ্রীহরি, রবিকর অপেক্ষা উজ্জ্বল আলোকে জগৎ উদ্‌ভাসিত করিয়া উপবিষ্ট। দেবগণ হর্ষে জয়ধ্বনি করিলেন।

এই জয়ধ্বনি চিরকাল অসুর হৃদয় কম্পিত করিয়াছে। আজ এই অসহ্য উজ্জ্বল জ্যোতিতে তাহারা অন্ধ, তদুপরি এ জয়ধ্বনি শ্রবণে অতিমাত্র ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। দেবগণ অতিকষ্টে তাহাদিগকে বুঝাইয়া শুঝাইয়া ফিরাইলেন। অসুরগণকে ভীত

দেখিয়া নারায়ণ তেজ সম্বরণ করিলেন এবং প্রসন্ন মুখে দেবাসুরগণকে আশ্বাস দিলেন। তাহাদিগকে গিরি-বহনে অসমর্থ দেখিয়া সামান্য মাটির ঢেলার ন্যায় মন্দরকে গরুড়ের পৃষ্ঠে তিনি স্বহস্তে তুলিয়া দিলেন ; গরুড় তাহা সাগরের মধ্যস্থলে রাখিয়া আসিল। শ্রীহরির চিরভক্ত দেবগণ ও স্বার্থে-ভক্ত অসুরগণ তাঁহার মধুর স্বভাব, মনোহররূপ দর্শনে আনন্দিত হইলেন। তিনি, কোনও বিপদ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে স্মরণ করিতে বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

অমৃত পানের লোভে বাসুকী রজ্জুর ন্যায় মন্দর গিরিকে বেষ্টন করিয়া এক দিকে লেজ ও এক দিকে মাথা বাড়াইয়া দিলেন। এখন কাহারা সাপের লেজ ধরিয়া টানিবেন, কাহারা মাথার দিকে টানিবেন, এই লইয়া তর্ক আরম্ভ হইল। দেবগণ বলিলেন, "আমরা জ্যেষ্ঠ, আমরা সাপের মাথার দিক ধরিব।" দৈত্যগণ বিজয়ী, কাজেই তাহারা লেজে হাত দিতে নারাজ। তখন বুদ্ধিমান ইন্দ্র, অসুরের দাবী মানিয়া লইয়া, বাসুকীর লেজ ধরিতে গেলেন। বিবাদ সহজেই মিটিয়া গেল। অহঙ্কারে অসুরগণের পতনের আরম্ভ বুঝিয়া, ইন্দ্র অন্তরে উৎসাহিত হইলেন। 'হরি হরি' ধ্বনি সহকারে মহা উৎসাহে মন্থন আরম্ভ হইল।

৫

একটু টানাটানি করিতে না করিতেই বাসুকী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন; আর তাহার বিষাক্ত নিশ্বাসে অসুরগণ জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। তাহারা, মানের জন্য নিজে যাচিয়া বাসুকীর মাথায় ধরিয়াছে—কাজেই দেবগণকে কিছু বলিবার যো নাই; কেবল নিজেদের মধ্যে কলহ আরম্ভ করিল। কিন্তু দেবগণের নিকট একথা প্রকাশ পাইলেও লজ্জার বিষয়, তাই নীরবে এ কষ্ট সহিতে হইল।

এদিকে আর এক বিপদ উপস্থিত। মন্দর গিরি, ঘূরিয়া ঘূরিয়া, সাগরের তলায় পাঁকে বসিয়া যাইতে লাগিল। দেবতাদের ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বকর্ম্মা কত বুদ্ধি কত কৌশল খাটাইতে লাগিলেন, কিন্তু সাগরের গভীর পঙ্কে এই গুরুভার পর্ব্বত তুলিয়া রাখা সম্ভব হইল না। সব মতলব মাটি হইবার উপক্রম। বিপন্ন দেবাসুর শ্রীহরিকে মন-প্রাণে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ভক্ত-বৎসল আবার দেখা দিলেন। ভক্তগণের বিপদ দেখিয়া বহুরূপী শ্রীহরি, নারায়ণরূপে মন্থন কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন এবং বহুযোজন বিস্তৃত এক কূর্ম্ম-রূপে, সাগরতলে প্রবেশ করিয়া মন্দর গিরিকে পৃষ্ঠে ধারণ করিলেন। দেবাসুরগণ, সেই অত্যদ্ভুত ভক্তবৎসল-

রূপ চিন্তা করিতে করিতে দ্বিগুণ উৎসাহে আবার মন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন।

দেবাসুরের সম্মিলিত শক্তিতে, কূর্ম্মাবতারের পৃষ্ঠে সেই বিশাল পাষাণগিরি ভীমবেগে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। জলের প্রচণ্ড শব্দে ব্রহ্মাণ্ডের জীবকুল স্তম্ভিত হইল, আকাশে দ্রুতবেগে চলিতে চলিতে গ্রহগণ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, দেবাসুরগণের কর্ণ যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

অকস্মাৎ এক তীব্র গন্ধে দেবাসুরগণের মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সমুদ্রজলে ভীষণ কাল এক পদার্থ ভাসিয়া উঠিয়া কৃষ্ণজ্যোতিতে জগৎ মসীবর্ণ করিয়া ফেলিল। তীব্র গন্ধে প্রায় সকলেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীহরি দেবরাজকে বলিলেন, "ইন্দ্র, তুমি সত্বর কৈলাসে যাও। কৈলাসনাথ মহাযোগী শঙ্কর ব্যতীত এই কালকূট বিষ পান করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।" ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ কৈলাসে চলিয়া গেলেন।

কৈলাসপতি বিল্বমূলে যোগাসনে সমাধিমগ্ন। মহামায়া তাঁহার সেবার আয়োজনে ব্যস্ত। ইন্দ্র, মায়ের চরণে প্রণত হইয়া সব বিবরণ জানাইলেন। করুণাময়ী গৌরী, কর্ণমূলে ওঙ্কারধ্বনি করিয়া মহাদেবের সমাধি

ভঙ্গ করিলেন। দেবতাদের বিপদ শ্রবণে আশুতোষ ঈষৎ হাস্য সহকারে ইন্দ্রকে আশ্বাস দিয়া বৃষবাহনে চক্ষের নিমেষে, ক্ষীরোদ সাগরের দিকে যাত্রা করিলেন।

সাগরের জলে কালকূট বিষ মাখনের মত ভাসিতেছিল। শঙ্কর তথায় উপস্থিত হইয়া প্রসন্ন মুখে তাহা পান করিলেন। জগৎ স্নিগ্ধ হইল, দেবাসুরগণ চৈতন্য পাইতে লাগিলেন। ভোলানাথ শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া আনন্দে ডমরু বাজাইয়া "ব্যোম্, ব্যোম্" ধ্বনি করিতে করিতে নাচিতে লাগিলেন। তীব্র কালকূট ভক্ষণে তাঁহার কোনও কষ্টই হইল না; কেবল বিষের তীব্র তাপে তাঁহার কণ্ঠে একটি নীল চিহ্ন রহিয়া গেল। সেই অবধি তাঁহার নাম হইল "নীলকণ্ঠ"। শিব, দেবাসুরগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বৃষবাহনে, কৈলাসধামে চলিয়া গেলেন। আবার মন্থন আরম্ভ হইল।

৬

শ্রীহরি সকলকে খুব উৎসাহ দিতে লাগিলেন। সহসা, জলরাশি ভেদ করিয়া সুরভী নাম্নী একটি চমৎকার গাভী উঠিয়া আসিল। সেই গাভীর আশ্চর্য্য ক্ষমতা এই যে, বাছুর না হইলেও সে দুধ দেয়। আবার একটু আধটু দুধ নয়, যত ইচ্ছা দোহন কর, অজস্র দুধ পাইবে।

শ্রীবিষ্ণুর পরামর্শে, তাহা যাজ্ঞিক ঋষিগণকে দান করা হইল।

সুরভীর পর, একটি একটি করিয়া ঐরাবত নামক এক প্রকাণ্ড ও সুন্দর শ্বেত হস্তী, উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব প্রভৃতি অনেক অনেক বস্তু সাগর হইতে উঠিতে লাগিল। নারায়ণ প্রায় সবগুলিই ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন। তার পর চারিদিক আলো করিয়া কৌস্তুভ নামক একটা বড় মণি উঠিল। নারায়ণ নিজের গলায় তাহা ধারণ করিলেন।

তার পর মূর্ত্তিমতী সৌন্দর্য্যরূপিনী এক যুবতী রমণী, মন্থন বেগে সাগর জলে ভাসিয়া উঠিলেন। দেবাসুরগণ মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। দেবী জল হইতে উঠিয়া আসিয়া বিষ্ণুর গলায় এক অম্লান পঙ্কজ মালা পরাইয়া তাঁহাকে স্বামিত্বে বরণ করিলেন।

অসুরগণ বিষ্ণুর ভয়ে এই অবিচার দেখিয়াও চুপ করিয়া রহিল। হয় ত তাহারা ভাবিল, 'বিষ্ণু ত সদা সর্ব্বদা তাহাদের সঙ্গে থাকিবেন না, পরে দেবতাদের কাছ হইতে এ সব কাড়িয়া লওয়া অতি সোজা কাজ। এ সময় হাঙ্গাম বাধাইলে অমৃত লাভে বিঘ্ন হইতে পারে। একবার অমৃত পাওয়া যাক্, তার পর দেখা যাইবে।'

অবশ্য অসুরদের এ সব জিনিসের অর্দ্ধেকের উপর

দাবী ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু তাহারা এ সব পাইলে যে আরও অত্যাচারী হইয়া উঠিবে, জগতের আরও অনিষ্ট করিবে। তাহাদের এ সব না পাওয়া কি ভাল হয় নাই ?

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সমুদ্র মন্থন চলিল। সেই প্রকাণ্ড পাষাণ গিরি টানাটানি করিয়া দেবাসুরগণ এমন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, আর তাহাদের হাত চলে না ; শরীর অবশ হইল, মাথা ঘূরিতে লাগিল। বিশেষতঃ বাসুকী রক্ত বমন করিতে করিতে একেবারে অচেতন মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। অসুরগণ বাসুকীর শ্বাসে ও মন্থনলব্ধ দ্রব্যের ভাগ না পাইয়া নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া গিয়াছিল, এখন সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া দেবতাদের উপর বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল "দেবতাদের মতলব ভাল নহে, কোন কূট অভিসন্ধি হয় ত তাহাদের মনে আছে।" কানা-কানি, নানা গোপন ষড়যন্ত্র হইতে লাগিল।

এমন সময় বড় স্নিগ্ধ, বড় সুগন্ধি বাতাস বহিতে লাগিল। শরীর নূতন বলে, নূতন উৎসাহে চেতনাময় হইয়া উঠিল, অকারণ আনন্দে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে এক স্নিগ্ধ জ্যোতিতে দিবালোক ম্লান হইয়া গেল। যেন স্বর্গ হইতেও মহত্তর ও আনন্দময় কোন দেশের বিভা প্রকাশিত হইল। দেবাসুরগণ আনন্দে

যেন অজ্ঞাতসারে, এক সুরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তাহাদের বুঝিতে বাকী রহিল না সকল শ্রম সার্থক করিয়া অমৃত উদ্‌ভূত হইয়াছে।

এক সুবর্ণ কলস হাতে লইয়া এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ উঠিয়া আসিলেন। কী তাহার চোখ মুখের ভঙ্গিমা! তরুণ বয়স, অমৃত ভাণ্ড বহন করিবার উপযুক্ত লোক! দেবতারা ইহার নাম রাখিলেন ধন্বন্তরি।

৭

ধন্বন্তরি উঠিয়া আসিবামাত্র অসুরগণ অমৃতের লোভে উন্মত্ত হইয়া কলসীটি কাড়িয়া লইল। দেবতারা ক্রুদ্ধ হইয়া অসুরদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু নারায়ণের ইঙ্গিতে তাঁহারা নিরস্ত হইলেন। অসুরগণ নিজেরাই ভয়ানক ঝগড়া করিতে লাগিল। সকলেই সর্ব্বাগ্রে সুধাপানের জন্য ব্যস্ত। অধিক বলবান দৈত্যেরা কলসী লইয়া ভয়ানক ধস্তাধস্তি আরম্ভ করিল। অবশিষ্ট দৈত্যগণ চেঁচামেচি, তর্ক বিতর্ক কোলাহল করিতে লাগিল। কেহ কেহ দুর্ব্বলের বল ধর্ম্মের দোহাই দিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল, "এ ভারি অন্যায়, দেবাসুরে মিলে অমৃত তুল্‌লে, এখন তোমরা একলা একলা খাবে নাকি? দেবতারাই ত এই বুদ্ধি বের্ করেছিল। তারা না হয়

দুটো হাতী ঘোড়া নিয়ে গেছে। তা বলে কি অমৃতের ভাগ পাবে না? এ ভারী অধর্ম্ম, ভারী অন্যায়! এই বুঝি ভাই ভাই! ছিঃ ছিঃ ধিক্ ধিক্।”

লক্ষ লক্ষ অসুর এইরূপ কলহে রত। অবস্থাটা ভাব দেখি! যেন একটা জীবসাগর উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত! কিন্তু সহসা যেন মন্ত্র বলে সমস্ত কোলাহল একেবারে নিস্তব্ধ। আকাশে ভাসিতে ভাসিতে এক যুবতী অসুরগণের মধ্যে উপস্থিত। যে যেখানে ছিল, রমণীর মুখপানে চাহিয়া নির্ব্বাক হইয়া গেল। একি রূপ! মন প্রাণ যেন চোখের ভিতর দিয়া টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া যায়।

রমণী যুবতী, গৌরী, অতি সুন্দরী; কত মণিমাণিক্য খচিত অলঙ্কার তাহার দেহে; কী অসম্ভব উজ্জ্বল রঙ্গের বসন তাহার পরণে। তিনি হাসিতে হাসিতে অসুরদের সঙ্গে কথা কহিলেন। কী মধুর তাহার কণ্ঠস্বর!

“এ দিকে যেতে যেতে ভয়ানক গোলমাল শুনে এলাম। কী এমন বিষয়, যা-নিয়ে এত গুলি বীর তোমরা ঝগড়া কচ্ছ? এর কি কোনও মীমাংসা হয় না?

দৈত্যগণ সুধাকলস দেবীর নিকটে রাখিয়া বিবাদের কারণ বর্ণনা করিলে, দেবী এমন এক অট্টহাসি হাসিলেন যে, অসুরগণের এমন কি দেবগণের পর্য্যন্ত, বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

দেবী বলিলেন, "এ ত সামান্য কথা। এরি জন্য ঝগড়া ? এস, আমি সব মিটিয়ে দিচ্ছি।" এই বলিয়া তিনি কলসীটি কক্ষে তুলিয়া লইলেন। দেবাসুরগণ, যন্ত্র চালিতবৎ দেবীর কার্য্য কলাপ দেখিতে লাগিলেন। কথা বলা দূরে থাক্, জোরে নিশ্বাস ফেলিতেও যেন কি এক সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। কে এই রমণী, কোথা হইতে আসিল, মিত্র বা অরি ; এসব চিন্তা কাহারও মনে উঠিল না। দেবাসুর তাহার কর্ত্তৃত্ব মন্ত্রমুগ্ধবৎ মানিয়া লইল।

দেবী বলিলেন, "দেবতা ও অসুর দুই পাশে সারি দিয়ে বস। আমি যে যেমন উপযুক্ত তেমন ভাগ দিচ্ছি।"

সুরাসুরেরা সারি দিয়া বসিলেন। দেবী অসুরদের সহিত বড় হাস্য কৌতুক জুড়িয়া দিলেন। ক্রমে অসুরদেরও মুখ খুলিয়া গেল। তাহারাও দেবীকে ঠাট্টা তামাসা আরম্ভ করিল। দেবী সুরগণকে সুধা বিতরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রূপ মুগ্ধ, অজিতেন্দ্রিয় অসুরগণ রূপের মোহে ভুলিয়া রহিল, যুবতীর হাস্য রস অমৃতের রস হইতেও তাহাদের মধুর বোধ হইল ; হাসির রোল উঠিল, আনন্দের ফোয়ারা খুলিয়া গেল।

রাহু নামক অসুর বড় চতুর। সে ভুবন মোহিনীর কাণ্ড একটু বুঝিতে পারিয়া 'চাচা আপনি বাঁচা' ভাবিয়া,

চুপ চাপ দেবতার সারিতে, চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যস্থলে, আসিয়া বসিয়া রহিল। তাহার হাতে অমৃত পড়িতে না পড়িতে, চন্দ্র ও সূর্য্য তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণুকে ইঙ্গিতে জানাইলেন। বিষ্ণু তৎক্ষণাৎ সুদর্শনচক্রে রাহুর মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। কিন্তু সে ততক্ষণে অমৃত চট্ করিয়া মুখে দিয়া, খানিকটা গিলিয়া ফেলিয়াছে। কাজেই তাহার মাথাও বাঁচিল, স্কন্ধও বাঁচিল। এক অসুর ভাঙ্গিয়া দুই অমর হইয়া গেল। অমৃত পান করিয়া সে দেবতাদের এক নিম্ন শ্রেণীতে, নবগ্রহ মধ্যে ভর্ত্তি হইল। কিন্তু চন্দ্র সূর্য্যের উপর তাহার ক্রোধ এখনও যায় নাই। তাই পর্ব্বে পর্ব্বে চন্দ্র বা সূর্য্যকে সে এখনও গিলিবার চেষ্টা করে। তাই মাঝে মাঝে গ্রহণ হয়।

দেবতাদের দিতে দিতে সুধা নিঃশেষ হইয়া গেল। মোহিনী দেবী সহসা তাহা লক্ষ্য করিয়া, চমকিয়া উঠিয়া, অপূর্ব্ব সলজ্জ ভঙ্গী সহকারে, অসুরদিগকে বলিলেন, "তাইত গা, কথায় কথায় সব শেষ করে ফেলেছি! তোমরাই ত ঠাট্টা তামাসা করে আমার মন ভুলিয়ে দিলে! কি হবে গা?" এমন এক করুণ নিরুপায় দৃষ্টিতে তিনি চাহিলেন যে, অসুরগণ অমৃতের কথা ভুলিয়া গেল। তুচ্ছ অমৃতের জন্য, ইহার মনে কি ব্যথা দেওয়া চলে? এই দৃষ্টির কাছে তুচ্ছ অমৃত, তুচ্ছ জীবন!!

দেবী প্রসন্ন বরাভয় করা মাতৃমূর্ত্তি দেবতাদের নিকট প্রকাশ করিয়া আকাশে মিলাইয়া গেলেন। অসুরগণের তখন চমক ভাঙ্গিল। অসংযমের ফল হাতে হাতে পাইয়া, লজ্জায় তাহারা কেহ কাহারও মুখপানে চাহিতে পারিল না। দীর্ঘকাল ব্যাপী দারুণ কষ্টের এই পরিণাম! সম্মুখে অমৃতপান-তৃপ্ত দৃপ্ত দেবগণ! পাতাল বাস, পরাজয়, মৃত্যুও যে ইহা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেয়ঃ ছিল!!

দেবগণ উচ্চৈঃস্বরে মোহিনী রূপিণী শ্রীহরির মায়াশক্তির জয় ঘোষণা করিলেন। এই ধ্বনি দৈত্য হৃদয়ে বজ্রাধিক আঘাত করিল। বঞ্চিত, অপমানিত অসুরগণ ক্ষেপিয়া উঠিয়া দেবগণকে আক্রমণ করিল; কিন্তু হায়, সুদিন চলিয়া গিয়াছে; তাহাদের সকল উদ্যমই ব্যর্থ হইল। অসংযমীর শক্তি ও জয় বড় ক্ষণস্থায়ী। অচিরে হতাবশিষ্ট মুষ্টিমেয় অসুর পাতালে অন্ধকারে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিল। দেবরাজ ইন্দ্র, স্বর্গসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া জগতের শান্তি বিধান করিলেন।

শ্রীহরি, জগতের অধীশ্বর হইয়াও, আশ্রিত ভক্তগণের কল্যাণের জন্য তুচ্ছ কূর্ম্মদেহ ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই অসীম করুণার কথা স্মরণ করিয়া আমরা

এখনও ভক্তবৎসল কূর্ম্মরূপে তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকি।

বরাহ চরিত।

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃত-শূকর রূপ
জয় জগদীশ হরে॥

১

সনকাদি কয়েকজন মুনিকে ব্রহ্মা সর্ব্ব প্রথম নিজের মনোমত করিয়া সৃষ্টি করেন। তাঁহাদিগকে ব্রহ্মার মানসপুত্র বলে। তাঁহারা ভগবান বই আর কিছুই জানিতেন না। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, অথবা কোন মতলব তাঁহাদের ছিল না। শিশুর মত সর্ব্ব বন্ধন-বিমুক্ত হইয়া তাঁহারা আনন্দে ত্রিলোকময় ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

একদিন তাঁহারা ঘুরিতে ঘুরিতে বৈকুণ্ঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বৈকুণ্ঠের বাহিরের শোভা তাঁহাদের শিশুহৃদয়ে বড়ই আনন্দ দান করিল। তাঁহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া শ্রীহরিকে দর্শন করিতে চলিলেন। কিন্তু বৈকুণ্ঠের দ্বারী জয় ও বিজয় তাঁহাদিগকে বাধা দিল। বালক-স্বভাব মুনিগণ বাধা না মানিয়া ভিতরে প্রবেশ

করিতে গেলে জয় ও বিজয় তাঁহাদিগকে বেত মারিল। তাঁহারাও শিশুর মত রাগিয়া দ্বারিগণকে গালাগাল দিতে দিতে অভিশাপ দিলেন, "তোরা বৈকুণ্ঠের দ্বারী হবার উপযুক্ত নহিস্। তোদের পতন হোক।"

অভিমানে মন একটু মলিন হইলেও জয় বিজয় ভগবানের দ্বারী ত বটে! মুনিদের অভিশাপ শ্রবণ মাত্র তাহাদের চৈতন্য হইল। ভীত হইয়া উভয়ে মুনিদের চরণে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে অন্তর্যামী শ্রীহরি ঋষিদের—তাঁহার প্রিয় ভক্তদের অপমানের কথা জানিতে পারিয়া নিজে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহাকে পাইয়া মুনিগণের কেহ তাঁহার চরণে পড়িল, কেহ হাতে ধরিল, কেহ কোলে উঠিল, যেন মাতৃহারা শিশুগণ মাকে পাইয়াছে। শ্রীহরি, তাঁহাদের ভালবাসা দেখিয়া, আনন্দে চারি হাতে মুনিদের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। জয় বিজয় বৈকুণ্ঠ হইতে তাড়িত হইবার ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

মুনিগণ একটু শান্ত হইলে, শ্রীহরি তাঁহাদিগকে আদর করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন; আর বলিলেন, "আমার দ্বারিগণ তোমাদের সঙ্গে বড় অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে। পুণ্যফলে বৈকুণ্ঠে আসিয়া ইহাদের বড় গর্ব্ব হইয়াছিল। তাহার উপযুক্ত শাস্তিও হইয়াছে।"

'সাধুর রাগ, জলের দাগ।' এতক্ষণে মুনিগণ রাগের কথা ত ভুলিয়াই গিয়াছেন, পরন্তু জয় বিজয়ের দুঃখে তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত। শ্রীভগবানকে ছাড়িয়া পাপ তাপ মোহময় জগতে ফিরিয়া যাওয়ার বাড়া দুঃখ কি জগতে আর আছে? কিন্তু ঋষিবাক্যের ত আর ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই। বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া যাইতেই হইবে। মুনিগণ শ্রীহরিকে বলিলেন, "প্রভু, যাহাতে ইহারা আপনার নিকট শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করুন।" শ্রীহরি বলিলেন, "ইহারা বহু সাধনা করিয়াছে বটে, কিন্তু অহঙ্কার ছাড়িতে পারে নাই। আরও সাতজন্ম তপস্যা না করিলে এই অহঙ্কারটুকু ত যাবে না।" সাত জন্মের কথা শুনিয়া জয় বিজয় ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল; তাহাদের দুঃখে মুনিগণও কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "প্রভু, একবার যে তোমার চরণাশ্রয় পাইয়াছে, তাহার পক্ষে তোমার বিরহ যে কত কষ্টকর, তাহা কি তুমি বুঝিতে পার না? একদিন দুইদিন নয়, সাতজন্ম তোমাকে ছাড়িয়া থাকা ভক্তের পক্ষে অসম্ভব। তুমি ইচ্ছাময়, ইহাদের শাস্তি কমাইয়া দাও।" ভগবান জয় বিজয়কে বলিলেন, "তোমরা শত্রুভাব নিয়ে মনুষ্য লোকে যাও। শত্রুভাব বড় তীব্র; লোকে শত্রুর কথা যত ভাবে, মিত্রের কথা তত ভাবে না। ঐ ভাবে তিন

জন্মেই তোমাদের অভিমান দূর হবে। প্রতিবার আমি স্বহস্তে তোমাদিগকে বধ করিব।"

(জয় বিজয় সত্য যুগে হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু, ত্রেতায় রাবণ কুম্ভকর্ণ, ও দ্বাপরে কংস শিশুপালরূপে জন্মগ্রহণ করে। শ্রীহরি স্বয়ং লীলারূপ ধারণ করিয়া তাহাদিগকে বধ করেন।)

২

মহর্ষি কশ্যপের দিতি ও অদিতি নামে দুই স্ত্রী ছিলেন। অদিতির গর্ভে আদিত্য বা দেবগণ, দিতির গর্ভে দৈত্যগণ জন্মগ্রহণ করেন। দিতির স্বভাবটা বড় ভাল ছিল না। তিনি দুইটি যমজ সন্তান প্রসব করেন। তাদের নাম রাখা হইল হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু। তাহারা শিশুকাল হইতেই দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল। তাহাদের ভয়ে পাড়ার ছেলেরা রাস্তায় বাহির হইত না। তাহারা ছিল মহারাগী, ঝগড়াটে, শরীর লোহার মত শক্ত, তাতে হাতীর বল; রাগিলে একটা খুন টুন না করিয়া ছাড়িত না। যত বয়স হইতে লাগিল, ততই তাহারা আরও ভীষণ হইয়া উঠিতে লাগিল। দয়া ধর্ম্মের ধার ত ধারিতই না, মারামারি কাটাকাটি তাহাদের নিত্য কর্ম্ম হইয়া পড়িল। গ্রামের লোককে উত্যক্ত করিয়া

তাহাদের তৃপ্তি হইল না, দেশে দেশে লোকের উপর অত্যাচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাজ্যের যত গুণ্ডা আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল। ক্রমে ক্রমে তাহাদের বেশ একটি দল জমিয়া উঠিলে, তাহারা সকল লোককে ইচ্ছামত শাসন করিতে লাগিল। অন্যান্য রাজাদের রাজ্য কাড়িয়া লইয়া প্রকাণ্ড এক সাম্রাজ্য গঠন করিল।

যুদ্ধে শরীর ক্ষত বিক্ষত হইলে যুদ্ধের আমোদ থাকে না। হিরণ্যাক্ষ তাই, শরীরটাকে অমর করিবার জন্য তপস্যা করিতে লাগিল। অসুরগণ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা এবং সংহারকর্ত্তা শিবকে ভক্তি করিত, কিন্তু প্রেমময় শ্রীহরিকে ভালবাসিত না। হিরণ্যাক্ষ ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করিল। ব্রহ্মা বর দিতে চাহিলে সে তাহার শরীরটাকে অমর করিয়া দিতে বলিল। কিন্তু ব্রহ্মা বলিলেন, "শরীর অমর হবে কিরূপে? ইহা যে পঞ্চভূতের সমষ্টি। কোন অস্ত্রাঘাত তোমার গায়ে লাগিবে না, আমি এই বর দিলাম।" হিরণ্যাক্ষ ভাবিল, অস্ত্রাঘাত গায়ে না লাগিলে আর যুদ্ধে পরাজয়ের ভয় নাই; সে ত সেই জন্যই অমর হইতে চায়। কাজেই সে এই বর পাইয়া ভারি সুখী হইল।

হিরণ্যকশিপু রাজ্যশাসন লইয়া ব্যস্ত রহিল।

হিরণ্যাক্ষ ভয়ানক গুণ্ডামি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। যেখানে শুনিল কোনও বলবান্ লোক আছে, সেখানেই গিয়া উপস্থিত হইল। কাহার সাধ্য তাহাকে আঁটিয়া উঠে; যাহার সঙ্গেই যুদ্ধ বাধিল, তাহারই মৃত্যু নিশ্চিত। কোনও অস্ত্রের আঘাত তাহার গায়ে লাগে না, কাজেই অন্যে তাহার কোনও অনিষ্ট করিতে পারে না। এই-রূপে মানব-জগৎ জয় করিয়া, সে লোহার এক ভীষণ গদা লইয়া, দেবলোকে উপস্থিত হইল। মানুষ চট্ করিয়া মরিয়া যায়, দেবতারা ত অমর, তাহাদের সঙ্গে একটু লড়িতে পারিব, এই ছিল তাহার মতলব। কিন্তু বুদ্ধিমান দেবতারা তাহার কাছে আগেই পরাজয় স্বীকার করিয়া গদাঘাত এড়াইলেন। এমন লোকের সঙ্গে কি যুদ্ধ করা চলে?

বিনা যুদ্ধে তাহার পেশীগুলি এমন শুড়শুড়ি আরম্ভ করিল যে, যুদ্ধ না করিলে আর প্রাণ বাঁচে না। এক-জন তাহাকে উপদেশ দিল, 'তুমি হিমালয়ের সঙ্গে যুদ্ধ কর।' তাই সে হিমালয়ের গায়ে গদাঘাত করিয়া একটু আরাম করিতে লাগিল। গদাঘাতে পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া চূরমার হইতে লাগিল। তখন হিমালয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বাহির হইয়া তাহাকে বলিলেন, "ওহে দৈত্য, কাঠ মাটির সঙ্গে কি কোন বীর যুদ্ধ করে? তুমি

বরুণদেবের কাছে সাগরে যাও, তোমার যুদ্ধের পিপাসা মিটিবে।”

হিরণ্যাক্ষ তখন হিমালয় ছাড়িয়া সাগরে গেল। হিরণ্যাক্ষের গদাঘাতে সাগর উছলিয়া উঠিল। মৎস্যগণ ভয়ে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। সাগররাজ্যে মহাবিপ্লব উপস্থিত হইল। সমুদ্রের দেবতা বরুণ, জলধিতল হইতে উঠিয়া আসিয়া বলিলেন, “ওরে গোঁয়ার, তুই কেন মিছে আমার সামান্য মাছগুলোকে ভয় দেখাচ্ছিস্। যদি তোর যুদ্ধ করিবার সাধ থাকে ত যা পাতালে। সেথায় বরাহরূপী শ্রীহরির কাছে তোর গর্ব্ব খর্ব্ব হবে।”

সে শ্রীহরির নাম আরও শুনিয়াছে। যখনই কোন দুর্ব্বলের উপর সে অত্যাচার করিয়াছে, তখনই তাহাকে বলিতে শুনিয়াছে, “আচ্ছা যা, শ্রীহরি আছেন।” সেই নাম শুনিলে তাহার প্রাণটা হিংসায় জ্বলিয়া উঠিত, ভাবিত তাহাকে একবার পাইলে হয়। কিন্তু এতকাল তাহার সন্ধান পায় নাই, আজ বরুণের মুখে শ্রীহরির একটা সন্ধান পাইয়া সে উৎসাহে আগুন হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, যেন শ্রীহরকে সে এখনই চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। সে উন্মাদের ন্যায় পাতালের দিকে ধাবিত হইল।

৩

পৃথিবী উত্তর মেরুটা একটু হেলিয়া সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরে। তাই দক্ষিণে সাগর মহাসাগর, উত্তরে দেশ মহাদেশ। একবার কোনও কারণে পৃথিবীর উত্তর মেরু আরও একটু নুইয়া পড়ে। তাহার ফলে সাগরের জলরাশি স্থলভাগ ডুবাইয়া ফেলে। জীবজন্তু সব মরিয়া গেল ; কেবল উচ্চ পর্ব্বত চূড়ায় দুই একজন মানুষ অতি কষ্টে বাঁচিয়া রহিল।

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, প্রধান ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বকর্ম্মার সাহায্যে পৃথিবী উদ্ধারের কত চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু কোনও ফল হইল না। ব্রহ্মা তখন শ্রীহরির শরণ নিলেন। শ্রীহরি এক বিরাট শ্বেত বর্ণ শূকরের রূপ ধরিয়া, পৃথিবীটি তাঁহার প্রকাণ্ড দন্তে গাঁথিয়া, আস্তে আস্তে টানিয়া পূর্ব্ববৎ করিয়া দিলেন। তখন সমুদয় জল দক্ষিণ সাগরে গেল, উত্তরের গ্রামনগর ভাসিয়া উঠিল। শ্বেত বরাহ জলমগ্না ধরণীকে উদ্ধার করিয়া পাতালে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

৪

হিরণ্যাক্ষ হরিকে খুঁজিতে খুঁজিতে পাতালে গিয়া উপস্থিত হইল। সেই প্রকাণ্ড শ্বেতবর্ণ শূকর, তাঁহার

সুবৃহৎ দন্ত, বিশাল উজ্জ্বল নয়ন দেখিয়া সে প্রথমতঃ অবাক্ হইয়া রহিল। তারপর যুদ্ধ করিবার একটা সুযোগ উপস্থিত ভাবিয়া সে আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "বাঃ, শূকর জলে চরছে।" সেই শব্দ শুনিয়া বরাহ এমন গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন যে, গ্রহ নক্ষত্র সহ ব্রহ্মাণ্ড কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার চোখ দুইটি হইতে যেন আগুন ছুটিতে লাগিল। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল, যেন তিনি জগতের যত ক্রোধ মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়াছেন। হিরণ্যাক্ষ বুঝিতে পারিল, এতদিনে তাহার যুদ্ধের পিপাসা মিটিবার সুযোগ উপস্থিত।

হিরণ্যাক্ষ লম্ফ দিয়া তাহার বৃহৎ লোহার গদা শূকরের মাথায় মারিল। শূকর একটু হটিয়া যাওয়াতে তাহার গদা বরাহের দাঁতে লাগিয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া চূরমার হইয়া পড়িল। তখন দুই জনের ভয়ানক ধস্তাধস্তি আরম্ভ হইল। তাঁহাদের পদাঘাতে পৃথিবী টলমল করিতে লাগিল। আঁচড়ে কামড়ে উভয়ে উভয়ের রক্তপাত করিতে লাগিলেন। রক্তে মেদিনী কর্দ্দমাক্ত হইল। কর্দ্দমে শূকরের যেমন সুবিধা হইল, হিরণ্যাক্ষের তেমনি ঘোর অসুবিধা হইতে লাগিল।

হিরণ্যাক্ষ এ জন্মে সমযোদ্ধা পায় নাই, কিন্তু আজ যেন শূকরের নিকট জয়ের আশা কম। তাহার গায়ের

রক্ত ক্রোধে উষ্ণ হইয়া যেন টগবগ করিতে লাগিল। সহসা সেই বিরাট শূকর তাহার নাসাপথে দেহের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া গেল। ক্রোধে তাহার কি অবস্থা যে হইল তাহা বর্ণনা করা যায় না। নিজের হৃৎপিণ্ডটা ছিন্ন করিতে পারিলে সে শান্তি পাইত! লীলাময় শ্রীহরি যে তাঁহার ভক্তের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিলেন!!

বরাহ আবার বাহির হইয়া আসিলে উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। উভয়ের দেহ-রক্তে স্রোত বহিল। মনে হইল উভয়ের পদভরে পৃথিবী কক্ষচ্যুত হইয়া পড়িবে; তাহা হইলে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডই যে ধ্বংস হইবে। দেবগণ ভীত হইয়া অন্তরীক্ষে থাকিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। এ দিকে তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। ব্রহ্মা চীৎকার করিয়া বলিলেন, "প্রভু, সন্ধ্যা হয়ে এল, সন্ধ্যায় অসুরের শক্তি বাড়ে, এখনি ইহাকে সংহার করুন।" তখন বরাহ তাহার বজ্র সম তীক্ষ্ণ দন্তে দৈত্যের হৃদয় বিদীর্ণ করিলেন। রক্তে নদী বহিয়া যাইতে লাগিল। অসুর বহুক্ষণ হাত পা আছড়াইয়া ঠাণ্ডা হইল। স্বর্গ হইতে দেবগণ, আদি বরাহের জয়ধ্বনি সহ পুষ্প বৃষ্টি করিলেন।

৫

পৃথিবীর উদ্ধার হইল। বিনা অস্ত্রে হিরণ্যাক্ষ হত

হইল। দেবগণ যার যেখানে চলিয়া গেলেন। কিন্তু শ্রীহরি শূকররূপ ছাড়িলেন না। পাঁকে পড়িয়া আমোদ করিতে লাগিলেন। এক শূকরী আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দিল। ক্রমে তাঁহার অনেক কাচ্চা বাচ্চা হইয়া বেশ একটি দল হইয়া গেল। তিনি সদল বলে লোকা-লোক নামক পর্ব্বতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এ দিকে বৈকুণ্ঠে বিশ্বপতির অভাবে সকল কাজের ভারি বিশৃঙ্খলা উপস্থিত। ব্রহ্মা খুঁজিতে খুঁজিতে আসিয়া লোকালোক পর্ব্বতের ব্যাপার দেখিয়া ত অবাক্। অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করতঃ তিনি শ্রীহরির স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই রক্তবর্ণ চতুর্ম্মুখ হংস-বাহনকে দেখিয়া শ্রীহরি ভয়ে সদলে পলাইতে লাগিলেন। ব্রহ্মা হাসিতে হাসিতে শিবের নিকট গেলেন। শিব বিবরণ শুনিয়া বলিলেন, "এ তোমার মত সাধু পুরুষের কর্ম্ম নহে। এস আমি দেখাচ্ছি।"

শিব, হস্তীর ন্যায় শুণ্ড ও দন্ত বিশিষ্ট অষ্টপদী এক জন্তুর বেশ ধরিয়া, লোকালোক পর্ব্বতে গিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। আদি বরাহ তাহা শুনিয়া রুখিয়া আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। খুব যুদ্ধ হইল। তখন অষ্টপদী বরাহের গায়ে দাঁত বসাইয়া তাঁহাকে একে বারে চিরিয়া দুই ভাগ করিলেন। তখন শ্রীহরি, সেই

মৃতদেহ ত্যাগ করিয়া, শিবের সঙ্গে খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

পিতৃ পুরুষের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে এখনও ঘরে ঘরে সেই আদি বরাহরূপে, শ্রীহরির পূজা হইয়া থাকে।

নৃসিংহ চরিত।

তব কর-কমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিত-হিরণ্যকশিপু-তনুভৃঙ্গং।
কেশব ধৃত-নরহরিরূপ
জয় জগদীশ হরে॥

১

শ্রীহরি, বরাহরূপ ধারণ করিয়া হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া হিরণ্যকশিপু শোকে ও ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িল। বিশ্ববিজয়ী কনিষ্ঠ ভ্রাতা যে পরাজিত হইবে, এই কথা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। সে ভাবিয়াছিল, জগৎটা তাহাদের দুই ভাইএর লীলা-ক্ষেত্র: তাহাদের কাজে বাধা দিতে পারে, এমন কেহ এই জগতে নাই। শুধু বাধা দেওয়া নহে, একেবারে হত্যা! ক্রোধে তাহার সমস্ত দেহ যেন জ্বলিতে লাগিল। তাহার হুঙ্কার ও গর্জ্জনে চারিদিক কাঁপিয়া উঠিল।

সে ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "শ্রীহরি কে, কোথায় থাকে, তাহাকে জব্দ করিবার উপায় কি?" তাঁহারা বলিলেন,—"তিনি এই জগতের প্রভু, সকলের

আরাধ্য। তিনি বৈকুণ্ঠে থাকেন, যাগযজ্ঞ, ধর্ম্মকর্ম্ম সবই তাঁর উদ্দেশ্যে করা হয়। তাঁর ভক্তদিগকে তিনি বড় ভালবাসেন, সুতরাং তাদের কষ্ট দিলে তিনি কষ্ট পাবেন।”

দৈত্যরাজ ব্রাহ্মণদের কথায় বুঝিতে পারিল, কেবল গায়ের জোরে এই শত্রুর অনিষ্ট করা সম্ভব নহে। দৈব-বলে অমর না হইলে ইহার সঙ্গে শত্রুতায় মৃত্যু নিশ্চিত। তাই সে এক গিরিগুহায় গিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিল। সে পায়ের বুড় আঙ্গুলের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া এত মনযোগের সহিত তাহার ইষ্টদেব ব্রহ্মাকে ধ্যান করিতে লাগিল যে, তাহার আর বাহিরের হুঁস রহিল না; সমস্ত মনখানি ব্রহ্মাময় হইয়া গেল; শরীর আছে কি নাই, তাহার জ্ঞান রহিল না। প্রথমতঃ মশা, ডাঁশ তার পর উই, ক্রমে পিঁপড়া, ডেয়ো পিঁপড়া, এই সব মিলিয়া তাহার শরীরখানা ভাগাভাগি করিয়া উদরস্থ করিল। কেবল পঞ্জরটি গুহার ভিতর দাঁড়াইয়া রহিল।

তখন ব্রহ্মা তাহাকে দেখা না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। গুহায় আসিয়া, কমণ্ডলুর জল ছিটাইয়া তাহার দেহে রক্ত মাংসের সৃষ্টি করিলেন; মাথায় হাত দিয়া ধ্যান ভঙ্গ করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, “বৎস, আমি তোমার তপস্যায় তুষ্ট হইয়াছি, তুমি কি বর চাও বল।” সে

বলিল, "প্রভু, আমি অমর হইতে চাই।" ব্রহ্মা বলিলেন, "তাকি কখন হয় বাপু? অমর করিবার ক্ষমতা আমার নাই।" হিরণ্যকশিপু বলিল, "তাহা হইলে আমাকে এই বর দিন যেন কোন অস্ত্রে আপনার সৃষ্ট কোনও জন্তু দ্বারা, জলে স্থলে অনলে অনিলে দিবসে কিংবা রাত্রে আমার মরণ না হয়।" ব্রহ্মা বলিলেন "তথাস্তু।"

২

হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুভয় গেল। এখন সে শ্রীহরিকে জব্দ করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। বহু অসুর সেনা সহ সে প্রথমেই ত্রিলোক বিজয় করিল। দেবগণকে জয় করিয়াই নিরস্ত হইল না; স্বর্গের রাজা হইয়া দেবগণকে নিজ দাসত্বে নিযুক্ত করিল। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে ঘোষণা করিয়া দিল যে, কেহ শ্রীহরির উপাসনা করিলে তাহাকে শূলে দেওয়া হইবে; এমন কি শ্রীহরির নাম উচ্চারণই মহা অপরাধ। তাহাকে ধ্যান ভজন করিতে হইবে, তাহার নামে যজ্ঞাদি করিতে হইবে, তাহাকে জগদীশ্বর বলিয়া মানিতে হইবে। শ্রীহরিকে জব্দ করিবার চমৎকার ব্যবস্থা বটে! সাধুগণের ইহাতে কি কষ্ট যে হইল তাহা বলাই বাহুল্য। যাঁহারা সদ্ ব্রাহ্মণ তাঁহারা যাগযজ্ঞ ছাড়িয়া দিলেন, যাঁহারা চাটুকার তাঁহারা অসুরের

উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। অসুরগণ সাধুসজ্জনের উপর অত্যাচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ধর্ম্ম লোপ হইল, মানবজাতি পশুতে পরিণত হইল।

৩

হিরণ্যকশিপুর একটি খুব সুন্দর ছেলে জন্মিল। একটু বড় হইতেই তাহার মধুর চরিত্র সকলের মন আকর্ষণ করিল। সে বড় শান্ত শিষ্ট, একলা একলা খেলা করে, আপন মনে বেড়িয়ে বেড়ায়, সকলকে ভালবাসে। তাহার চেহারা সুন্দর, কণ্ঠ মধুর, চাল চলন মনোহর। তাহার নাম প্রহ্লাদ।

হিরণ্যকশিপু স্বভাবে অসুর হইলেও কশ্যপের ছেলে ত? কাজেই ব্রাহ্মণ। প্রহ্লাদ পাঁচ বৎসর বয়সে গুরু গৃহে উপনীত হইলেন। দৈত্যগুরু শুক্রের ষণ্ড ও অমার্ক নামে দুই পুত্র ছিলেন। তাঁহারা হইলেন প্রহ্লাদের গুরু। প্রহ্লাদ গুরুর বাড়ীতে সমবয়সী অনেক ছেলে পিলে পাইয়া খুব সুখী হইলেন ও তাহাদের সঙ্গে পাঠ আরম্ভ করিলেন। স্বরবর্ণ শুনামাত্রই শিখিয়া ফেলিলেন, কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণের “ক” অক্ষর শুনামাত্র তাহার মনে কি এক ভাব হইল, তিনি কেবলই কাঁদিতে লাগিলেন। সকলে অবাক্ হইয়া গেল, ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে

পারিল না। তিনিও কিছুতেই কোনও কথা বলিতে সমর্থ হইলেন না। দুই চারিদিন পরে তাঁহার এই ভাব একটুকু কমিল। তখন তিনি বলিলেন "ক" অক্ষর উচ্চারণ মাত্র তাঁহার কৃষ্ণের * কথা মনে পড়ে। কৃষ্ণকে তিনি এত ভালবাসেন যে ঐ অক্ষর উচ্চারণ মাত্র কৃষ্ণের জন্য তাঁহার মন অধীর হইয়া উঠে। পণ্ডিতগণ শাস্ত্র পড়িয়াছেন, কিন্তু ভক্ত ত দেখেন নাই। তাঁহারা ভাবিলেন, এ সব ছেলেমানুষী; এতটুকু ছেলে কৃষ্ণের কথা কিই বা জানে; কিছুদিন খেলা ধূলায় থাকিলে সব ভুলিয়া যাইবে। প্রহ্লাদও খেলায় মন দিলেন। ছেলেদের লইয়া হরিপূজা হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া নিজে মাতিয়া উঠিলেন, ছেলেদেরও মাতাইয়া তুলিলেন। নাম করিতে করিতে কখন কখন তিনি বেহুঁস হইয়া পড়িতেন, তখন সমাধিস্থ হইয়া তিনি শ্রীহরিকে দর্শন করিতেন। ছেলেদের মধ্যে অনেকেরই এইরূপ সমাধি হইতে লাগিল। পড়াশুনা বন্ধ হইল। হরিনামের ধ্বনিতে চারিদিক কাঁপিয়া উঠিল। ষণ্ডামার্ক প্রমাদ গণিলেন। প্রহ্লাদের কাজ কর্ম্মে এমন একটা মাধুর্য্য ছিল যে, সহসা তাহার প্রতিবাদ করা যাইত না। বিশেষতঃ রাজার ছেলের

---

* বিষ্ণুর একনাম কৃষ্ণ, কারণ তিনি কৃষ্ণবর্ণ।

খেয়ালে বাধা দেওয়া—তাও আবার হিরণ্যকশিপুর মত রাজার ছেলের—একটু ভাবিবার বিষয়। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে এই বিপদ উপস্থিত।

ষণ্ড ও অমার্ক প্রহ্লাদকে শাসন করিলেন। তাঁহারা বুঝাইলেন, হরি তাঁহার পিতার শত্রু ; কাকার হত্যাকারী। অতএব হরি তাঁহারও শত্রু বটে। হরি যে সকলের বন্ধু, কাহারও শত্রু হইতে পারেন না, প্রহ্লাদ এই বিষয়ে নানা যুক্তি দেখাইলেন। কিন্তু পণ্ডিতগণ, বিষয়িগণ কোনও কালে ভক্তের যুক্তি বুঝিতে পারেন না। শিক্ষকগণ প্রহ্লাদের কথা অসার জ্যাঠামি মাত্র ভাবিয়া ভারী বিরক্ত হইলেন। প্রহ্লাদ ও তাঁহার বন্ধুগণ কিছুতেই দমিলেন না। তাঁহারা দ্বিগুণ উৎসাহে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতগণ ভীত হইয়া রাজাকে এই সংবাদ জানাইলেন।

রাজা প্রহ্লাদকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা প্রহ্লাদ, কে তোমাকে আমাদের পরম শত্রু হরির কথা বলিয়াছে ?" প্রহ্লাদ অতি বিনয়ের সহিত বলিলেন, "পিতঃ, হরির কথা কেহ কাহাকেও শিখাইতে পারে না। হরি সকলের ভিতরেই আছেন। মন বাসনাহীন নির্ম্মল হইলে শ্রীহরি আপনি প্রকাশিত হন। তিনি আমাদের আত্মা, তিনি প্রাণের প্রাণ, তিনি শত্রু হইবেন কিরূপে ?" রাজা শিশুর মুখে এমন পাকা কথা শুনিয়া হাসিয়া

উঠিলেন, ভাবিলেন এ শিখান কথা। কোনও দুষ্টলোক ইহাকে এসব কথা শিখাইয়াছে। তিনি প্রহ্লাদকে আবার গুরুগৃহে প্রেরণ করিলেন। একদল সৈন্য পাঠাইয়া গুরুগৃহে কড়া পাহারা বসাইলেন, যেন অজানা অচেনা লোক প্রহ্লাদের কাছে আসিতে না পারে।

প্রহ্লাদ যাহা একবার শুনিতেন তাহাই মনে রাখিতে পারিতেন। কিন্তু ভগবানের কথা ব্যতীত কোনও কিছু-তেই মন দিতেন না। গুরু মহাশয়েরা তাহাকে নানা বিষয় শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু প্রহ্লাদ কৃষ্ণকথা কৃষ্ণগুণ কীর্ত্তন ব্যতীত আর কোনও শিক্ষায় কান দিলেন না। ষণ্ড ও অমার্ক আবার রাজাকে একথা জানাইতে বাধ্য হইলেন।

হিংসার মতন বিষ আর নাই। হিংসাবিষে দৈত্যরাজ জ্বলিয়া মরিতেছিল। তাহাতে আবার কাটা ঘায়ে নুণের ছিটা, পুত্র হরিভক্ত!! এই সংবাদ শুনিয়া তাহার শরীরটা জ্বলিয়া গেল। জ্বলিবার কথা বটে। যে ত্রিলোক হইতে হরিনাম তুলিয়া দিয়াছে, যাগযজ্ঞ ধর্ম্মকর্ম্ম বন্ধ করিয়াছে, তাহারই ছেলের ঘাড়ে হরি আসিয়া চাপিয়া-ছেন। পিতৃশত্রু পিতৃব্যহন্তা জানিয়াও এ হরির উপাসনা করে। নিশ্চয় কোনও মহাশত্রু পুত্ররূপে জন্ম লইয়াছে।

এ পরম শত্রু—এই ভাবিয়া সে প্রহ্লাদের শিরশ্চেদ করিতে ঘাতককে আদেশ দিল।

৪

ঘাতক, মশানে লইয়া প্রহ্লাদের গলায় অসির আঘাত করিল। প্রহ্লাদ কৃষ্ণচিন্তায় মগ্ন হইয়া রহিলেন, তাঁহার শিরশ্চেদ হইল না। ঘাতক ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া রাজাকে জানাইল। রাজা, শূলাঘাতে প্রহ্লাদকে হত্যা করিতে সৈন্যগণকে আদেশ দিলেন। নির্দ্দয় অসুরসৈন্য বারংবার শূলাঘাত করিয়াও প্রহ্লাদের গায়ে চিহ্নমাত্র রাখিতে সমর্থ হইল না। সৈন্যগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রাজাকে সংবাদ দিল। রাজা আদেশ দিলেন, "যাও, রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হস্তীর পদতলে ফেলিয়া ইহাকে পিষিয়া ফেল।" সৈন্যগণ, প্রহ্লাদকে হাতে পায়ে বাঁধিয়া এক মত্ত হস্তীর পদতলে ফেলিয়া দিল। কিন্তু হাতীর হৃদয়েও ত নারায়ণ আছেন! হাতী পদাঘাত না করিয়া শুঁড় দিয়া তাহাকে পিঠে তুলিয়া লইল। প্রহ্লাদ হাতীর উপর বসিয়া হরিনাম করিতে লাগিলেন।

রাজার জেদ এবং অসুরদের কৌতূহল চড়িয়া উঠিতে

লাগিল। ইহারা কোটী কোটী জীব হত্যা করিয়াছে কিন্তু, এ কোমলদেহ ছেলেটির কিছুই করিতে পারিতেছে না। রাজার আদেশ হইল, জলে ডুবাইয়া, আগুনে পোড়াইয়া, বিষ খাওয়াইয়া, যেরূপে হোক ইহাকে মারিয়া ফেলিতে হইবে। অসুরদের পক্ষে বেশ একটি মজার কাজ জুটিল। তাহারা ছেলেটিকে হত্যা করিবার নানা উপায় দেখিতে লাগিল।

অসুরগণ প্রহ্লাদকে হাতে পায়ে বাঁধিয়া, জলে ফেলিয়া, কুড়ি পঁচিশজনে বহিয়া আনিয়া তাহার উপরে এক পাথর চাপাইয়া দিল। কিন্তু পাথর জলে না ডুবিয়া শোলার মত ভাসিতে লাগিল, আর প্রহ্লাদের হাতের পায়ের বাঁধনি সব আপনাআপনি খুলিয়া গেল। তিনি পাথরের উপর বসিয়া হরিনাম করিতে লাগিলেন।

ভয়ানক সাপের বিষ আনিয়া তাহারা তাঁহাকে খাইতে দিল। প্রহ্লাদ শ্রীহরিকে নিবেদন না করিয়া কিছুই খান না, তাই বিষ খাইবার সময় তিনি তাহা শ্রীহরিকে নিবেদন করিলেন। বিষ অমনি অমৃত হইয়া গেল। প্রহ্লাদ সে অমৃত পান করিয়া আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন। প্রহ্লাদকে এক উচ্চ পর্ব্বতের শৃঙ্গে তুলিয়া সেখান হইতে ছুঁড়িয়া ফেলা হইল। কিন্তু তিনি পালকের ন্যায় বাতাসে ভাসিতে ভাসিতে হরিনাম করিতে লাগিলেন।

আর কি করা যায়! তাহারা দেখিল একমাত্র আগুনে ফেলা বাকী আছে। সে চেষ্টাও একবার করিয়া দেখিতে হইবে। কিন্তু বালকের কাণ্ড দেখিয়া অসুরগণের পাষাণ প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে, সকলেই আগু পাছু করিতে লাগিল। কিন্তু রাজার আদেশ অমান্য করাও বিপজ্জনক। কাজেই তাহারা প্রহ্লাদকে এক স্থানে বসাইয়া, পর্ব্বতপ্রমাণ কাঠ তাহার উপর চাপাইয়া আগুন ধরাইয়া দিল। আগুন দাউ দাউ করিয়া একেবারে আকাশে উঠিল এবং কয়েকদিন ধরিয়া জ্বলিয়া অঙ্গারে পরিণত হইল। তখন দেখা গেল জলন্ত অঙ্গারের স্তূপ মধ্যে প্রসন্ন বদনে প্রহ্লাদ যোগাসনে উপবিষ্ট, তাঁহার একগাছি কেশও পুড়ে নাই।

এমন ভয়ানক ব্যাপার কেহ কখনও দেখে নাই, শুনে নাই। দৈত্যরাজ এই সংবাদ পাইয়া প্রথমতঃ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। একে ত শত্রুর চিন্তায় হিংসায় তাঁহার হৃদয় পুড়িতেছে। দিন রাত্রি এক চিন্তা, এক আলোচনা, কিসে হরিকে জব্দ করা যায়। কি লজ্জার কথা, তাহার নিজের ছেলেই হরির ভক্ত। এই ত পাঁচ বছরের শিশু— রাজ্যের সকল বীর যোদ্ধা মিলিয়া তাহাকে মারিতে পারিল না। হরি কি এত শক্তি ধরেন!!

হিরণ্যকশিপু ভাবিতে ভাবিতে উন্মাদের মত হইয়া

গেল। তাহার চেহারাখানা এমন ভয়াবহ হইয়া উঠিল যে, কেহ তাহার সম্মুখে যাইতে সাহস করিল না। সে যেন জগৎটা এখনি গিলিয়া ফেলিবে।

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, বালকটি মহা যোগসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অভিচার ক্রিয়া ছাড়া ইহাকে হত্যা করা অসম্ভব। অস্ত্রাঘাত বা অনলাদি বাহিরের বস্তু ইহার কোনও অনিষ্ট করিতে পারিবে না। দৈব দ্বারা দৈব শক্তি নাশ করিতে হইবে।" অভিচারের বিরাট আয়োজন হইল। এক প্রকাণ্ড ধুনি জ্বালাইয়া তাহাতে বহু মণ ঘি ঢালিয়া ব্রাহ্মণগণ তন্ত্রমন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। যজ্ঞ শেষ করিয়া পূর্ণাহুতি দেওয়া মাত্র কৃষ্ণবর্ণ, রক্তচক্ষু, পিঙ্গল জটা ভৈরবগণ ত্রিশূল হস্তে যজ্ঞ-কুণ্ড হইতে উঠিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ প্রহ্লাদকে নিধন করিবার জন্য ইঁহাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু ভৈরবগণ ভক্তদ্বেষী অসুরগণকেই আক্রমণ করি-লেন। রাজ্যময় এক হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। প্রহ্লাদ অসুরদের কষ্ট দেখিয়া ভৈরবগণকে স্তবস্তুতি করাতে তাঁহারা অন্তর্হিত হইলেন।

কি ভয়ানক ব্যাপার! এই ছেলেটি কি সর্ব্বশক্তিমান? শেষে ইহার হাতেই কি মরিতে হইবে? হিরণ্যকশিপু পরাজয় কাহাকে বলে জানিত না। কিন্তু এযে

পরাজয়েরও বাড়া। সব চেষ্টাই ত ব্যর্থ হইল। আর কি করা যায় ?—

তখন সে প্রহ্লাদকে ডাকিয়া আনিল। প্রহ্লাদ পিতাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া করযোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই হরি হরি করিস, সে কোথায় থাকে ?" প্রহ্লাদ বলিলেন, "তিনি এই জগতের ঈশ্বর সর্ব্বত্রই থাকেন।"

হিরণ্যকশিপু, "এসব হেঁয়ালি রাখ্, সে এখন কোথায় আছে বল্।"

প্রহ্লাদ, "পিতঃ, আমি যে তাঁহাকে সর্ব্বত্রই দেখিতেছি।"

হিরণ্য, "সে কি এই স্ফটিকের স্তম্ভে আছে ?"

প্রহ্লাদ, "হাঁ পিতঃ, এই যে প্রভু আমার।"

হিরণ্যকশিপু 'এই যে' শুনিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছে। সে তৎক্ষণাৎ প্রাণপণে এক লাথি মারিয়া স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

যাই স্তম্ভ ভাঙ্গা, অমনি এক বিকট মূর্ত্তি গর্জ্জন করিতে করিতে স্তম্ভ হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার বৃহৎ মস্তকটি সিংহের ন্যায়। চারি হাতে ভয়ানক নখ। দেহটি মানুষের মত। তাঁহার হুঙ্কারে পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল। হিরণ্যকশিপুর তাঁহার সঙ্গে ভয়ানক যুদ্ধ হইল। অবশেষে

দিবা রাত্রির সন্ধিস্থলে, নিজ উরুতে ফেলিয়া, নখরাঘাতে সেই অপূর্ব্ব জীব হিরণ্যকশিপুর হৃদয় বিদারণ করিলেন।

হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া তাঁহার ক্রোধ নিবৃত্ত হইল না। তিনি ভয়ানক গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ ভয় পাইলেন, পাছে ক্রোধবশে ইনি জগৎ ধ্বংস করিয়া বসেন। কিন্তু কেহ ইহার সম্মুখে যাইতে সাহস করিলেন না। তাঁহারা প্রহ্লাদকে ইঁহার নিকটে গিয়া স্তব-স্তুতি করিতে উপদেশ দিলেন। প্রহ্লাদ তাঁহার কচি হাত দুইখানি জুড়িয়া শ্রীহরির স্তব আরম্ভ করিলেন। ভক্তের মধুর কণ্ঠস্বরে ভগবানের হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি প্রহ্লাদকে কোলে লইয়া গা চাটিতে লাগিলেন।

শরীর নরের মত ও মস্তক সিংহের মত বলিয়া ভগবানের এই মূর্ত্তির নাম নরসিংহ বা নৃসিংহ।

বামন চরিত।

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন
পদ-নখনীর-জনিত জনপাবন।
কেশব ধৃত-বামনরূপ
জয় জগদীশ হরে॥

১

হিরণ্যকশিপু বধের পর, শিশু প্রহ্লাদ দৈত্যদের রাজা হন। তাঁহার পুত্র বিরোচন বড় হইলে তাহার উপর রাজ্যভার দিয়া তিনি সাধন ভজনে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করেন। বিরোচন খুব বীর ও দাতা ছিলেন। দাতা বলিয়া তাঁহার ভয়ানক দম্ভ ছিল। তাই দেবগণ ব্রাহ্মণবেশে আয়ু ভিক্ষা করেন। বিরোচন আয়ু দান করিয়া দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র বলি তখন রাজা হইলেন।

বলি রাজা হইয়া ধর্ম্মকর্ম্মে খুব মন দিলেন। কিন্তু, বংশদোষে দেবতাদের সঙ্গে বিরোধ করিতেন। হিংসায় হিংসা বাড়ে। ক্রমে দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে, বলি পরাজিত ও অত্যন্ত আহত হন।

ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণ ছিলেন বলির পুরোহিত তাঁহারা খুব তপস্বী ছিলেন। তাঁহারা তপঃ প্রভাবে

বলিকে সুস্থ করিয়া তাঁহার দ্বারা বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করাইলেন। এই যজ্ঞের ফলে তাঁহার জগৎ জয় করিবার শক্তি হইল। দেবতাদের সঙ্গে বিবাদ ক্রমে বাড়িয়া চলিল।

বলি আবার স্বর্গ আক্রমণ করিলেন। সুরগুরু বৃহস্পতি দেবগণকে বলিলেন, "ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণের সহায়তায় বলি মহাশক্তি সঞ্চয় করিয়াছে এখন ইহাকে পরাস্ত করা অসম্ভব। কাজেই এখন যুদ্ধ না করিয়া স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও। মর্ত্ত্যে গিয়া গোপনে আত্মরক্ষা কর। কালক্রমে অসুর শক্তি নষ্ট হইলে আবার স্বর্গ অধিকার করিবে।"

দেবগণ স্বর্গ পরিত্যাগ করিলেন। বলি স্বর্গের রাজা হইলেন। ভৃগুবংশীয় পুরোহিতগণের পরামর্শে একশত অশ্বমেধ করিয়া তিনি ইন্দ্রের সমান হইয়া উঠিলেন। বলি বংশগৌরব, নিজের গৌরব ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য দুই হাতে দরিদ্র ও ব্রাহ্মণগণকে দান করিতে লাগিলেন। দান করিতে করিতে দানের ইচ্ছা তাঁহার এত বাড়িয়া গেল যে, তিনি "কল্পতরু" হইলেন; অর্থাৎ রাজ্যময় ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, তাঁহার নিকট যে যাহা চাহিবে, সে তাহাই পাইবে। ত্রিভুবনে দরিদ্রের কষ্ট রহিল না। চারিদিকে "বলির জয়" ধ্বনি উঠিল। অসুরগণের গৌরব শেষ সীমায় পৌঁছিল।

সকল দোষের বড় দোষ অহঙ্কার। যে অহঙ্কারী এ জগতে তাহার মিত্র নাই। বলি ধার্ম্মিক বলিয়া, দাতা বলিয়া, অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিলেন। তাঁহার কথার উপর কথা বলিবার লোক ছিল না। ক্রমে অহঙ্কারে মন মত্ত হইয়া উঠিল। বলি যা ইচ্ছা তাই করিয়া ধর্ম্মপথ হইতে সরিয়া পড়িতে লাগিলেন। অসুরগণ, বলির গৌরবে অহঙ্কৃত হইয়া লোকের উপর অত্যাচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। স্বজাতির মান রাখিবার জন্য, স্বজাতীয়গণের উপর নিজের প্রভুত্ব রাখিবার জন্য, বলি তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না, শুনিয়াও শুনিলেন না।

ধর্ম্ম প্রাণের বস্তু। যে যত বেশী ধার্ম্মিক তার ধর্ম্মের জাঁক তত কম। ধর্ম্মের জাঁকজমক থাকিলে লোকের কাছে মান হয়। তাই সংসারে দেখা যায় "গরু মেরে জুতা দান" করিলে লোকে বড় ধার্ম্মিক মনে করে। তাই যারা মান চায় তারা অসদুপায়েও ধন অর্জ্জন করিয়া খুব দান, ঘটা করিয়া পূজাঅর্চ্চা করে। যাহারা এরূপ করে হিন্দুশাস্ত্রে তাহাদিগকে অসুর বলে। শরীর ভাল থাকে, আয়ু বাড়ে, ধন দৌলত হয়, খুব ভোগ হয়, স্বর্গে বাস হয় এই ভাবিয়া যে ধর্ম্ম করা সে ধর্ম্মের সঙ্গে ভগবানের কোনও সম্পর্ক নাই। এই ভাবের লোক ধর্ম্ম করে বটে, কিন্তু প্রয়োজন হইলে যে কোনও অসৎকার্য্য

করিয়া নিজ গৌরব রক্ষা করে। ভোগই উদ্দেশ্য। যেখানে ভোগের সঙ্গে ধর্ম্মের বিরোধ হয় সেখানে অনায়াসে ইহারা ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে। মান, গৌরব, শক্তি, ভোগ মাত্রই ইহাদের লক্ষ্য। বলি, বিশেষতঃ অন্যান্য অসুরগণ, এই ভাবের ভাবুক ছিলেন। বলির দেহে প্রহ্লাদের রক্ত ছিল, তাই তাহার ধর্ম্মের দিকে মন ছিল। কিন্তু, অন্যান্য অসুরগণ ভোগ ছাড়া আর কিছু চাহিত না।

২

কশ্যপের পত্নী অদিতি ছিলেন দেবতাদের মাতা। দেবগণ অসুরের ভয়ে স্বর্গ ছাড়িয়া ছদ্মবেশে অত্যন্ত কষ্টে দিন যাপন করেন। অদিতির মনে তাই নিদারুণ ব্যাথা। কশ্যপ ত দিনরাত তপস্যায় মগ্ন, ছেলেদের মঙ্গলামঙ্গল তিনি দেখেন না। কাজেই অদিতি বিষণ্ণ মনে ভগবানের কাছে অহরহঃ ছেলেদের মঙ্গল প্রার্থনা করেন। কশ্যপ অদিতির ব্যাকুলতা দেখিয়া তাঁহাকে নানা ব্রত করিতে উপদেশ দিলেন। অদিতির কঠোর তপস্যায়, নারায়ণ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন।

অদিতি বলিলেন "প্রভু, আমার পুত্রগণের দুঃখ আর সহ্য হয় না। তাহাদের শত্রু বিনাশ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।"

নারায়ণ বলিলেন, "ইহাদের কর্ম্ম ক্ষয় না হইলে বিনাশ করা অসম্ভব। তুমি অপেক্ষা কর। যুগধর্ম্ম স্থাপনের জন্য আমি তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিব। তখন অসুরগণকে স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিব। তুমি খুব পবিত্র ভাবে জীবন যাপন কর। আর এই কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিও না।"

অদিতি দিবারাত্র ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত রহিলেন। কিছুদিন পরে, তাঁহার গর্ভে ব্রহ্মতেজোময় এক অপূর্ব্ব শিশু জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার বয়স পাঁচ বৎসর হইলে বুদ্ধিমান ও শ্রুতিধর দেখিয়া কশ্যপ তাঁহাকে গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই বালক সর্ব্ব বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বয়স বাড়িলেও শরীরখানা সেই পাঁচ বছরের শিশুর মতনই রহিয়া গেল। তাই তিনি 'বামন' নামে পরিচিত হইলেন।

৩

নর্ম্মদা নদীর তীরে ভৃগুকচ্ছ নামে এক রমণীয় স্থান ছিল। বলি তথায় এক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। দৈত্যগুরু কূটবুদ্ধি শুক্র যজ্ঞের প্রধান পরিচালক, জগতের সমুদয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সভায় উপস্থিত। নানা

দিগ্‌দেশ হইতে কত ব্রাহ্মণ, কত দরিদ্র বলির যজ্ঞে দান লইতে আসিতেছে এবং স্বেচ্ছামত দান লইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে যাইতেছে। অন্নদান, বস্ত্রদান, ভূমিদান, গোদান, স্বর্ণদান, দানের অন্ত নাই। জগতের দারিদ্র্য দুঃখ মোচন করিতে সঙ্কল্প করিয়া বলি 'কল্পতরু' হইয়াছেন। বলির জয় জয়কার জগৎময়।

একদিন বামনদেব ছোট একখানা ছাতা মাথায় দিয়া বলির সভায় উপস্থিত হইলেন। সেই ব্রহ্মতেজোময় শিশু মূর্ত্তির অপূর্ব্ব মুখশ্রী সভাস্থ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। রোদে তাঁহার মুখখানা লাল হইয়া গিয়াছিল। সেই কচি মুখের পথশ্রমে ক্লান্ত ভাব দেখিয়া সকলের মনে স্নেহ ভাবের উদয় হইল। বলি স্বহস্তে আসন দিয়া তাঁহাকে বসাইলেন; কতদূর হইতে আসিয়াছেন, কাহার ছেলে প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিয়া পা ধুয়াইলেন, মাথায় অর্ঘ্য দিলেন, মধুপর্ক খাইতে দিলেন। পূর্ব্বকালে কোনও মান্য অতিথি আসিলে এইরূপেই অভ্যর্থনা করা হইত।

ভিক্ষার্থীরা যেমন দাতার যশ কীর্ত্তন করে, বেশী পাওয়ার জন্য দাতাকে উত্তেজিত করে, বামনদেবও তেমনি বলির ও তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের কীর্ত্তি কাহিনী বিষয়ে মধুর কণ্ঠে, বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। হিরণ্য-কশিপুর বীরত্ব, প্রহ্লাদের ভক্তি, বিরোচনের দানশীলতা,

বলির যজ্ঞ, দান, বিনয়, সৌজন্যের এমন চমৎকার বর্ণনা তিনি করিলেন যে, সভাস্থ সকলে মুগ্ধ হইয়া গেল। সকলেই ভাবিল, "এ ছোক্‌রা আজ একটা রাজ্য টাজ্য আদায় না করে ছাড়বে না।"

বলি অতি বিনীত ভাবে বলিলেন, "প্রভু, আপনি যদি এ দাসের নিকট হইতে কোনও দান গ্রহণ করেন, তবে আমি কৃতার্থ হই।" বামনদেব বলিলেন, "হাঁ, আমি সামান্য কিছু প্রার্থনা করিতেই আসিয়াছি; কারণ আপনি দাতাগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমি ত্রিপাদ পরিমাণ ভূমি চাই।"

বামনদেবের প্রার্থনা শুনিয়া সভাস্থ কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলি বলিলেন, "প্রভু, আপনি শিশু। আপনার স্বার্থ আপনি কিছুই বুঝেন নাই। আপনি কাহারও কাছে কিছু প্রার্থনা করেন নাই; কেবল কৌতূহল বশে আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। আমি ত্রিজগতের স্বামী। আমার নিকট এমন প্রার্থনা করুন, যাহাতে আর প্রার্থনা করিতে না হয়।"

বামনদেব বলিলেন, "যদি মনে তৃপ্তি না থাকে, তবে সসাগরা ধরার অধিকারী হইয়াও অভাব ঘুচে না। ইন্দ্রিয় বশে থাকিলে ত্রিপাদ ভূমি পাইলেই আমার তৃপ্তি হইবে। আমি ত্রিপাদ ভূমি মাত্রই চাই।"

বলি তখন ত্রিপাদ ভূমি দান করিবার জন্য জল হাতে লইলেন। শুক্র এতক্ষণ চুপ করিয়া সব কথা শুনিতেছিলেন। তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এ ব্রাহ্মণ শিশু কোনও ছদ্মবেশী দেবতা। তাই তিনি বলিকে দান করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু অভিমানী, তেজস্বী বলি একবার 'দিব' বলিয়া ভয়ে আবার 'দিব না' বলিতে কিছুতেই রাজি হইলেন না। শুক্র অনেক বুঝাইলেন। বলি বলিলেন, "আমি প্রহ্লাদের পৌত্র, বিরোচনের পুত্র। পিতামহ যে সত্যের জন্য শিশু কালে কত কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, পিতা যে সত্যের জন্য দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, আমি কিছুতেই সে সত্য ভঙ্গ করিব না। ইনি ছদ্মবেশী দেবতা হইলে আমার ক্ষতি কি? সত্য রক্ষার ফলে আমার সদ্গতি হইবে। জীবনের ভয়ে সত্য ভঙ্গ করিয়া আমি নরকগামী হইতে চাহি না।" এই বলিয়া বলি কমণ্ডলু হাতে লইলেন। শুক্র, যুক্তি তর্কে বাধা দিতে না পারিয়া যোগ শক্তি বলে কমণ্ডলুর ভিতরে ঢুকিয়া কমণ্ডলুর মুখ বন্ধ করিলেন। জল হাতে লইয়া দান করিতে হয়। বলি কমণ্ডলুর মুখ বন্ধ দেখিয়া, কুশের দ্বারা খোঁচা দিয়া, জলের পথ খুলিয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। কুশের আঘাতে শুক্রের এক চক্ষু কাণা হইয়া গেল। তিনি কমণ্ডলু হইতে বাহির হইয়া বলিকে অভিশাপ দিলেন, "তুই শ্রীভ্রষ্ট হ।"

বলি বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বামনদেবকে ত্রিপাদ ভূমি দান করিলেন। সহসা বামনদেবের চেহারা বদলাইয়া গেল। তিনি এক পা দ্বারা সমস্ত পৃথিবী আবৃত করিলেন, আর এক পা দ্বারা আকাশ ঢাকিয়া ফেলিলেন, তৃতীয় পাদ রাখিবার আর স্থান রহিল না। দুই পায়ের মধ্যস্থল হইতে আর এক পা বাহির করিয়া, তাহা কোথায় রাখিবেন বলিকে বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সভাস্থ সকলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। বলি কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন, বামনদেব উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, “রাজা, তুমি না বলেছিলে, আমার সকল অভাব তুমি মোচন করিতে সমর্থ। আমাকে অবোধ শিশু বলেছিলে, কই, এখন বাক্য রক্ষা করিতেছ না কেন ? এখন সত্য ভঙ্গের জন্য তোমাকে নরকে যাইতে হইবে, প্রস্তুত হও।” এই বলিয়া দেবদূতগণকে আহ্বান করিবামাত্র, তাহারা আসিয়া বলিকে বন্ধন করিল। দৈত্যগণ রাজার এই দুর্দ্দশা দেখিয়া মায়াবী বামনদেবকে আক্রমণ করিল, কিন্তু বলি তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন। রাজ্যময় হাহাকার ধ্বনি উঠিল।

প্রহ্লাদ নির্জ্জনে অহর্নিশি শ্রীকৃষ্ণচরণ চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। বলি বিপদ সময়ে মনে মনে তাঁহাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ নিজ ইষ্টদেবের আবির্ভাবে

তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি রাজসভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। নারায়ণের অদ্ভুত মূর্ত্তি দেখিয়া, তিনি প্রেমে বিহ্বল হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। বামন দেব তীব্র স্বরে বলির সত্যভঙ্গের কথা প্রহ্লাদের নিকট বলিলে, প্রহ্লাদ বলিলেন, প্রভু, দাতা বলিয়া বলির বড় অহঙ্কার হইয়াছিল। কিন্তু যোগীজন দুর্ল্লভ আপনার শ্রীচরণ দর্শন হইল তাহার ফল। আপনার করুণা কোন হেতুর অধীন নহে। আপনি যজ্ঞফলদাতা, আপনি দর্শন দিয়া যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিলেন। এখন আপনার তৃতীয় চরণ বলির মস্তকে স্থাপন করিয়া সত্যভঙ্গ পাপ হইতে রক্ষা করুন।”

বলির সকল অহঙ্কার এখন দূর হইয়াছে। শ্রীহরির কৃপায় তাহার দিব্য দৃষ্টি খুলিয়াছে। তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে বামনদেবের চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। ভক্তবৎসল তাঁহার তৃতীয় চরণ বলির মস্তকে স্থাপন করিয়া তাহার বাক্য রক্ষা করিলেন এবং প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, “বলি, তুমি অসুরদের চিরনিকেতন পাতালে যাও। আজ হইতে তুমি অমর হইলে, আর আমি গদা হস্তে তোমার দ্বার রক্ষা করিব।” আত্মসমর্পণের ফলে বলি ভগবানের অশেষ করুণা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। দেবগণ আবার স্বর্গের অধিকার পাইয়া সুখী হইলেন।

বলির দর্প হরণ করিয়া বামন যুগধর্ম্ম প্রচার করিলেন।

অস্থরদের প্রভাব দূর হইল, ধার্ম্মিকগণ শান্তি লাভ করিলেন।

১ম ভাগ সমাপ্ত

দশাবতার চরিত।

দ্বিতীয় ভাগ।

পরশুরাম চরিত।

ক্ষত্রিয়-রুধিরময়ে জগদপগতপাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিত-ভবতাপং।
কেশব ধৃত ভৃগুপতিরূপ
জয় জগদীশ হরে॥

১

সকল জীবই আত্মরক্ষার জন্য কাজ করে। মানুষ কাজও করে চিন্তাও করে। চিন্তা করিয়া মানুষ নিজের উন্নতির নানা উপায় বাহির করে।

প্রথমে সকল মানুষ এক বর্ণ ছিল। ক্রমে মানুষের চিন্তা বাড়িয়া গেলে কাজও বাড়িল। এক দল লোককে সমাজের মঙ্গলের জন্য কেবল চিন্তা লইয়াই থাকিতে হইল; তাঁহারা হইলেন ব্রাহ্মণ। কাজের ভার দুই দল লোক লইলেন। এক দল খুব তেজস্বী ও বুদ্ধিমান;

তাঁহারা হইলেন সমাজের স্বার্থরক্ষক ও দুষ্ট লোকের শাসক ক্ষত্রিয়। আর একদল তেমন বুদ্ধিমান না হইলেও খুব কর্ম্মপটু, তাঁহারা বৈশ্য, সমাজের ধনবর্দ্ধক। স্থূলবুদ্ধিহীন-প্রকৃতি মানুষ পরিশ্রমের ভার লইলেন ও সমাজ সেবক শূদ্র হইলেন। এক মানবজাতি এইরূপ চারিবর্ণে বিভক্ত হইলেন।

ব্রাহ্মণ হইলেন সমাজের মস্তিষ্ক, তাঁহারা সমাজের মঙ্গলের উপায় চিন্তা করেন। ক্ষত্রিয় বাহু, তাঁহারা সেই উপায় অবলম্বনে সমাজকে উন্নত করেন। মস্তিষ্কের যেমন প্রয়োজন, বাহুরও তেমনি প্রয়োজন। উভয়ে সম্মিলিত ভাবে কাজ না করিলে সমাজের কল্যাণ হয় না।

কিন্তু, দল বাঁধিলে বিবাদটা সহজেই আসিয়া পড়ে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে প্রায়ই নানা বিষয়ে বিবাদ বাধিত। সময় সময় যুদ্ধ পর্য্যন্ত হইত। ব্রাহ্মণ সাধনা তপস্যা দ্বারা সমাজের একটা উপকারের উপায় বাহির করিলেন; কিন্তু ক্ষত্রিয়গণ হয় ত তাহা গ্রহণ করিলেন না, গ্রাহ্য করিলেন না। যেমন,—ব্রাহ্মণ বলিলেন ক্ষত্রিয় বালককে বাল্যকালে ব্রাহ্মণের নিকট বেদাধ্যয়ন করিতে হইবে, কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে; ক্ষত্রিয় হয় ত ভাবিলেন, 'বেদাধ্যয়ন অবশ্য করা দরকার,

তবে এত কঠোরতা ও ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব অনাবশ্যক। রাজার ছেলে এত করিতে যাইবে কেন?' ব্রাহ্মণ দেখিলেন, যাহাদের হাতে রাজ্যের শাসনভার, তাহারা ভোগ-সুখে আসক্ত অবিনয়ী, গুরুসেবাহীন হইলে সমাজের মঙ্গল নাই। কাজেই বিবাদ বাধিল, একদল যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, অন্যদলের অধীনতা স্বীকার না করা পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল।

এইরূপে একবার ক্ষত্রিয়গণ ঐশ্বর্য্যের গৌরবে বড়ই অহঙ্কারী হইয়াছিলেন। দেশের সকল ধন, সকল লোক তাঁহাদের অধীন। এই অবস্থায় ধর্ম্মের নিয়ম মানিয়া চলা, ব্রাহ্মণদের আদেশ পালন করা, তাঁহাদিগের অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহারা ধর্ম্মের নীতি ও ধর্ম্মযাজকদিগকে অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দেখাদেখি সকলেই ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিল। আর্য্যধর্ম্ম বেদাচার লোপ হইল, সাধুভাবে সমাজে থাকা অসম্ভব হইয়া পড়িল। ধর্ম্মজ্ঞান-হীন ইহসর্ব্বস্ব অসুরগণ সমাজে কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিল।

২

প্রাচীন ভারতে ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। এই বংশে অতি তেজস্বী অনেক যোগী পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। ভৃগুর পুত্র মহর্ষি ঋচীক

যে কেবল পণ্ডিত ও তপস্বী ছিলেন তাহা নহে, যুদ্ধ-বিদ্যায়ও তিনি পারদর্শী ছিলেন। গাধিরাজার কন্যা মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ভগিনী সত্যবতীকে তিনি বিবাহ করেন। সত্যবতী, তাঁহারই ন্যায় তপঃপরায়ণা ও ভক্তিমতী ছিলেন।

মহর্ষি ঋচীক, ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থানে ব্যথিত হইয়া, জগতের হিতের জন্য বহু তপস্যা করিলেন। আদর্শ ব্রাহ্মণ ও আদর্শ ক্ষত্রিয়ের মিলিত শক্তি ব্যতীত মানবজাতির কল্যাণের আর দ্বিতীয় উপায় নাই বুঝিয়া তিনি এক মহাযজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞে দুইটি চরু প্রস্তুত করেন। যজ্ঞে ব্যবহৃত পায়সকে চরু বলে। একটি হইল ক্ষাত্রতেজোময় চরু, তাঁহার শ্বাশুড়ীর জন্য, অপরটি নিজ পত্নীর জন্য ব্রহ্মতেজোময় চরু। চরু পাইয়া গাধি-পত্নী ভাবিলেন, জামাতা নিশ্চয় নিজ পত্নীর জন্য উৎকৃষ্ট চরু প্রস্তুত করিয়াছেন। তাই তিনি কন্যার নিকট চরু পরিবর্ত্তনের অভিলাষ জানাইলে সরলা সত্যবতী তাহাতে স্বীকৃতা হইলেন। উভয়ে পরিবর্ত্তিত চরু যথারীতি ভক্ষণ করিলেন।

মহর্ষি ঋচীক ইহা শুনিয়া বড়ই বিরক্ত হইলেন এবং স্বামীবাক্য অবহেলা করিবার জন্য সত্যবতীকে ভৎসনা করিয়া উভয় চরুর প্রভেদ বুঝাইয়া দিলেন। শান্ত ব্রাহ্মণ-

কুলে উগ্রপ্রকৃতি ক্ষত্রিয় জন্মগ্রহণ করিবে শুনিয়া সত্যবতী বড় ভয় পাইলেন এবং চরু ভক্ষণের ফল খণ্ডনের জন্য ঋচীককে বড়ই অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। ঋচীক তপোবলে সেই ক্ষত্রিয়শক্তি তাঁহার পুত্র হইতে পৌত্রে পরিবর্ত্তিত করিলেন।

ঋচীকের পুত্র জমদগ্নি পিতার নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া শাস্ত্র তপস্যা ও ধনুর্বিদ্যায় অসাধারণ ক্ষমতা লাভ করিলেন এবং রেনুকা নাম্নী একটি গুণবতী রমণীকে বিবাহ করিয়া আদর্শ গৃহস্থের জীবন যাপন করিতে লাগি-লেন। তাঁহার পাঁচটি পুত্র জন্মে, সর্ব্ব কনিষ্ঠের নাম রাম।

রাম বাল্যকাল হইতেই অসাধারণ ক্ষাত্রতেজ দেখাইতে লাগিলেন। শাস্ত্রপাঠে তপস্যায় তাঁহার অমনোযোগ ছিল না; কিন্তু ধনুর্ব্বিদ্যায় তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ দৃষ্ট হইল। কোনও অন্যায় দেখিলে তৎক্ষণাৎ বলপ্রয়োগে তাহার প্রতিকার করিতেন, ব্যায়াম ক্রীড়া ও পশু শিকার লইয়া সর্ব্বদা মাতিয়া থাকিতেন। বিদ্যা শিক্ষা শেষ হইলে কঠোর তপস্যা করিয়া মহাদেবকে প্রসন্ন করেন। মহাদেব তাঁহাকে দুইটি বর দিলেন, একটি ইচ্ছামৃত্যু, নিজে ইচ্ছা না করিলে রোগ, অস্ত্রাঘাত বা জরাতে তাঁহার মৃত্যু হইবে না; অপরটি এক পরশু বা কুঠার যাহা হাতে থাকিলে

কেহ তাঁহাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারিবে না। এই পরশু সহায়ে তিনি একুশবার ক্ষত্রকুল বিজয় করেন, তাই তাঁহার নাম হইয়াছে পরশুরাম।

একদিন কোন কারণে জমদগ্নি রেনুকার উপর এমন ক্রোধ করেন যে, তাঁহার পুত্রগণকে ডাকিয়া রেণুকার মাথা কাটিয়া ফেলিতে আদেশ দেন। রাম তখন আশ্রমে ছিলেন না। পুত্রগণ পিতার এই ভয়ানক আদেশ পালন করিতে পারিলেন না, পিতৃ শাপের ভয়ে একেবারে অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। এমন সময়ে রাম গৃহে ফিরিয়া দেখিলেন পিতা ক্রোধে অগ্নিবৎ, ভ্রাতৃগণ ভয়ে মূর্চ্ছিত। তাঁহাকে দেখিয়া জমদগ্নি মাতৃবধের আদেশ দিলেন। রাম তৎক্ষণাৎ পিতৃ আজ্ঞা পালন করিলেন। জমদগ্নি রামের উপর প্রসন্ন হইয়া চারিটি বর দিতে চাহিলে তিনি চাহিলেন,—

(১) তাঁহার জননী জীবন লাভ করিয়া যেন হত্যার কথা ভুলিয়া যান।

(২) ভাই সব জ্ঞান লাভ করিয়া যেন সব ভুলিয়া যান।

(৩) যুদ্ধে যেন কেহ তাঁহাকে জয় করিতে না পারে।

(৪) তিনি যেন দীর্ঘজীবী হন।

৩

হৈহয় নামে জনৈক প্রবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় বীর নর্ম্মদা নদীতীরে নিজের নামে এক রাজ্য স্থাপন করেন। সুপ্রসিদ্ধ মাহিস্মতী নগরী ঐ রাজ্যের রাজধানী ছিল। হৈহয়বংশে কীর্ত্তিবীর্য্যের পুত্র অর্জ্জুন বহু তপস্যা করিয়া, যোগ প্রভাবে একা এক সহস্র লোকের শক্তি ধরিতেন বলিয়া তাঁহাকে সহস্র বাহু এবং কীর্ত্তিবীর্য্যের পুত্র বলিয়া কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন বলা হয়। একদা বিশ্বশ্রবা মুনির পুত্র রাবণ, দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে নর্ম্মদা নদীতীরে হৈহয়রাজ্যে শিবির সন্নিবেশ করেন। অর্জ্জুনের শত শত পত্নী ছিলেন। তিনি পত্নীগণসহ নর্ম্মদাতে জল ক্রীড়া করিতেন। পুরাণে লিখিত আছে অর্জ্জুন সহস্রবাহু দ্বারা নর্ম্মদার স্রোত রুদ্ধ করেন। রাবণ নদীতীরে বসিয়া পূজা উপাসনা করিতেছিলেন। নদী ফুলিয়া উঠিয়া রাবণের পূজার উপকরণ সব ভাসাইয়া লইয়া যায়। এই বিষয় লইয়া উভয়ে যুদ্ধ বাধে। বহু যুদ্ধের পর রাবণ পরাজিত ও বন্দী হন। বিশ্বশ্রবা মুনি এ সংবাদ পাইয়া নিজে কার্ত্তবীর্য্যের নিকট উপস্থিত হন এবং পুত্রকে ছাড়িয়া দিতে অনুনয় বিনয় করিয়া রাবণকে মুক্ত করেন।

অবশ্য রাবণ বহুকাল পরে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া

আমাদের বিশ্বাস। একটা লোকের হাজার হাত থাকাও সম্ভব নহে। তবে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন একজন মহাবীর ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

একদা অর্জ্জুন, মৃগয়া উপলক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে সসৈন্যে জমদগ্নির তপোবনে অতিথি হইলেন। জমদগ্নি বহু সমাদরে অর্জ্জুনের অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি ছিলেন মহাযোগী পুরুষ, তাঁহার অসাধ্য কিছুই ছিল না; দরিদ্র ব্রাহ্মণ হইলেও যোগবলে রাজাকে সর্ব্ববিধ খাদ্যাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন। অহঙ্কারী লোভী অসুর প্রকৃতি অর্জ্জুন কোথায় কৃতজ্ঞ হইবে, না হিংসায় জ্বলিয়া গেল। মুনির একটি কামধেনু ছিল। রাজা মুনির নিকট সেই ধেনুটি চাহিলে মুনি বলিলেন,—"আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, যাগযজ্ঞে ঘি দুধের প্রয়োজন, কতকগুলি গাভী রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। এই একটি গাভীতেই আমার কাজ হয়। আমি এ গাভী দিতে পারিব না।" "কি আশ্চর্য্য, দরিদ্র ব্রাহ্মণের কি সাহস। একটা সামান্য গাভী আমি চাহিলাম, সে মুখের উপর প্রত্যাখ্যান করিল। সকলে ব্রাহ্মণদের মান দিয়া মাথায় তুলিয়াছে। আমি রাজা, আমার আদেশ অমান্য করিতেও ভয় পাইল না।" এই ভাবিয়া অর্জ্জুন বলে গাভী লইয়া যাইতে চাহিলেন। কিন্তু যোগবলের উপর বল নাই।

রাজা, গাভী হরণ করিতে অসমর্থ হইয়া রাজ্য ফিরিয়া গেলেন।

ভয়ানক প্রতিহিংসায় রাজার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি বহু সৈন্য সামন্ত লইয়া ঋষির আশ্রম আক্রমণ করিলেন। মুনি তখন সমাধিমগ্ন ছিলেন। তাঁহার শিরশ্ছেদ করিয়া রাজা কামধেনুটি লইয়া চলিয়া গেলেন।

রাম কোনও কার্য্য উপলক্ষে আশ্রম হইতে অন্যত্র গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তপোবন লণ্ড ভণ্ড, আশ্রমবাসীর রক্তে ভূমি রঞ্জিত, এমন কি মহর্ষি জমদগ্নি যোগাসনে নিহত। কি ভীষণ দৃশ্য, কি ধর্ম্মের গ্লানি। গাভীর লোভে ব্রহ্মবধ, ঋষিবধ! ধর্ম্মরক্ষক ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ইহা যে কি অন্যায়, ভাবিয়া স্থির করা যায় না। রহিল পিতার মৃতদেহ, শ্রাদ্ধ তর্পণের কথা শেষে! আগে এই পৃথিবীর ভার, মানবজাতির শত্রুকে সংহার করিয়া তবে অন্য কথা!! মূর্ত্তিমান প্রতিহিংসা রাম কুঠার হস্তে মাহিষ্মতী নগরের দিকে ধাবিত হইলেন। কর্ত্তব্য যখন স্থির হয়, তখন সম্ভব অসম্ভবের প্রশ্ন মানুষের মনে জাগে না। মহাবীর অর্জ্জুনের সহস্র সহস্র সৈন্য-রক্ষিত মাহিষ্মতী নগর আক্রমণ করিতে সামান্য এক কুঠার লইয়া এক ব্রাহ্মণতনয় একাকী যাত্রা করিলেন।

রাম, নগরে প্রবেশ করিয়া উন্মাদের মত মানুষ কাটিতে লাগিলেন। তাঁহাকে কেহ রোধ করিতে সমর্থ হইল না। নগরের লোক ভয় পাইয়া পালাইতে লাগিল। রাম, কুঠারাঘাতে সিংহদ্বার ভাঙ্গিয়া রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন। সৈন্যগণের অস্ত্রাঘাতে তাঁহার সর্ব্ব শরীর ক্ষত বিক্ষত হইল বটে, কিন্তু তাঁহাকে কেহ নিবারণ করিতে পারিল না। সমস্ত রাজধানী রক্তে প্লাবিত করিয়া তিনি অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন এবং অজেয় কুঠারাঘাতে তাঁহাকে নিধন করিয়া আশ্রমে ফিরিলেন।

৪

জমদগ্নিহত্যা ও অর্জ্জুনবধের কাহিনী, রঞ্জিত অতি-রঞ্জিত হইয়া মুখে মুখে সমস্ত ভারতে প্রচার হইল। এত বড় তপস্বী ঋষিকে এক গাভীর জন্য হত্যা করায় ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের পক্ষীয় লোক ভয়ানক চটিলেন। সামান্য এক ব্রাহ্মণতনয় কুঠারাঘাতে এত বড় রাজা ভারত বিখ্যাত বীর অর্জ্জুনকে বধ করিল, এ সংবাদ ক্ষত্রিয়দের অসহ্য হইয়া উঠিল। সমস্ত দেশময় এই এক আলোচনা, আন্দোলন চলিল। ক্ষত্রিয়গণ রামকে দণ্ড দিবার বিপুল আয়োজন করিতে লাগিলেন। তপস্বী ব্রাহ্মণগণ জগতের হিতের জন্য ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। পুরোহিত

ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয় নিধনের জন্য রুদ্রের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। রজোগুণী ব্রাহ্মণগণ অস্ত্রধারণ করতঃ রামের সেনাপতিত্বে বিপ্র সৈন্যদল গঠন করিলেন।

উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। রামের অদ্ভুত বীরত্বে ক্ষত্রিয়গণ দাঁড়াইতে পারিলেন না; বার বার পরাস্ত হইতে লাগিলেন। রাম, কুঠার হাতে শত্রু সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া, 'কচু' কাটার ন্যায়, মানুষ কাটিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয় বীরগণের অধিকাংশ নিহত হইলে যুদ্ধ থামিল। ব্রাহ্মণগণ, পরশুরামের নেতৃত্বে দেশে ধর্ম্ম সংস্থাপনের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

কয়েক বৎসর শান্তিতে কাটিল। কিন্তু পরাজিত ক্ষত্রিয়গণ নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া ধীরে ধীরে সৈন্যদল গঠন করিতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে ক্ষত্রিয় বংশের বালকগণও যুবক হইয়া উঠিল। আবার তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে আক্রমণ করিলেন। ভয়ানক রক্তপাত ও লোকক্ষয় হইল। ক্ষত্রিয়গণ আবার পরাজিত ও নিহত হইলেন।

আরো কয়েক বৎসর শান্তিতে কাটিল। ব্রাহ্মণগণ ভাবিলেন, ক্ষত্রিয়গণ আর মাথা তুলিতে পারিবেন না। কিন্তু মহাতেজস্বী ক্ষত্রিয়গণ প্রতিশোধ লইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আবার সৈন্য সংগৃহীত হইল, আবার

যুদ্ধ বাধিল। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সম্মিলিত রক্তে স্রোত বহিল, মৃতদেহে ধরণী ছাইল। এইরূপ একুশবার যুদ্ধ হয়। হিংসা ক্রমে বাড়িয়া ঘোর নিষ্ঠুরতায় পরিণত হইল ন্যায় অন্যায় বোধ রহিল না; যে যেরূপে পারিল শত্রু সংহার করিবার চেষ্টা করিল।

যুদ্ধ করিতে করিতে রাম একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিলেন। তাঁহার হিংসা এমন বাড়িয়া গেল যে, যুদ্ধে পরাজিত ক্ষত্রিয়গণকে তিনি ধরিয়া বন্দী করিলেন; কুরু-ক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী সমস্তপঞ্চকে পাঁচটি গর্ত্ত খনন করিয়া বন্দী ক্ষত্রিয়গণের মাথা কাটিয়া তাঁহাদের রুধিরে গর্ত্তগুলি পূর্ণ করিলেন; সেই গর্ত্তের রুধিরে পিতৃতর্পণ করিয়া তিনি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইলেন। ক্ষত্রিয়কুলের শিশুগণকে পর্য্যন্ত কুঠারাঘাতে হত্যা করিয়া ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিলেন; এমন কি, গর্ভবতীর উদর চিরিয়া গর্ভস্থ ভ্রূণ, পুরুষ হইলে তাহাকেও কুঠারাঘাতে দ্বিখণ্ড করিলেন।

সমস্ত ভারত রামের ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। অতি বড় সাহসী ব্যক্তিও তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতে সমর্থ হইল না। তাঁহার সম্বন্ধে কত অলৌকিক ঘটনা লোকে কল্পনা করিল। তিনি আসিতেছেন শুনিলে লোকে প্রাণ ভয়ে লুকাইয়া থাকিত। তাঁহার নামই এক বিভীষিকা হইয়া

উঠিল, কেহ সহসা 'পরশুরাম' শব্দ উচ্চারণ করিলে সকলে চমকিয়া উঠিত।

অনবরত যুদ্ধের ফলে দেশে নীতিধর্ম্ম দূর হইল। ঋষিগণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তাঁহারা রামকে হিংসা পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। আর হিংসা করিবার কেহ ছিলও না; ক্ষত্রিয়বংশ ত নির্ম্মূল হইয়াই গিয়াছে। রাম বুঝিতে পারিলেন তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে, জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। তখন তাঁহার ব্রাহ্মণভাব জাগিয়া উঠিল; একমুখী মন হিংসাবশে সহস্র দিকে ধাবিত হইয়া তাঁহাকে পীড়িত করিয়া তুলিল,—ব্রাহ্মণের শান্ত সমাহিত মন পাইবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইলেন। ঋষিদের হাতে পৃথিবী শাসনের ভার দিয়া তিনি একেবারে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলেন এবং ভারত সাগরে মহেন্দ্রপর্ব্বত নামক এক দ্বীপে গিয়া কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন।

তখন ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মানুসারে দেশ শাসন করিবার ব্যবস্থা করিলেন। কয়েকজন ক্ষত্রিয় রমণী, গর্ভরক্ষার জন্য রামের ভয়ে পাহাড়ে জঙ্গলে লুকাইয়া ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ বহু সন্ধান করিয়া তাঁহাদিগকে বাহির করিলেন, তাঁহাদের গর্ভজাত পুরুষ-সন্তানদিগকে সযত্নে পালন করিয়া উপযুক্ত রূপে ধর্ম্মশিক্ষা দিলেন; এবং তাঁহারা বড় হইলে রাজ্য

শাসনের ভার তাঁহাদিগের হস্তে অর্পণ করিলেন। কাজে কাজেই ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের অনুগত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্মের নিয়ম মানিয়া চলিতে লাগিলেন। দেশে ধর্ম্ম ও শান্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইল, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিবাদ চিরকালের জন্য মিটিয়া গেল।

শ্রীরাম চরিত।

বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতি-কমনীয়ং
দশমুখ-মৌলি-বলিং রমণীয়ম্।
কেশব ধৃত-রামশরীর
জয় জগদীশ হরে॥

১

প্রভুত্ব লইয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিবাদ আর নাই। ধর্ম্মসাধন, ভগবান লাভই মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, ইহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছে। সমাজরক্ষার জন্য সমগ্র মানবজাতি চারি বর্ণে বিভক্ত; সকল বর্ণই নিজ নিজ কার্য্য, স্বধর্ম্ম বলিয়া শ্রদ্ধার সহিত সম্পাদন করিতেছে। সমাজে শান্তি বিরাজিত। সাধুগণ ভগবানের জন্য কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত। কিন্তু ভগবানের কৃপা ব্যতীত ভগবানের দর্শন লাভ হয় না; ভগবান গুরুরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া শিক্ষা না দিলে শাস্ত্রের দ্বারা বুদ্ধির দ্বারা ভগবান লাভের পথ পাওয়া যায় না। কাজেই মানুষ ব্যাকুল হইয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিল।

পুলস্ত্যবংশীয় বিশ্বশ্রবার পুত্র রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ, ব্রাহ্মণোচিত শাস্ত্রাদি শিক্ষা করিয়া, কঠোর

তপস্যা করেন। রাবণ ও কুম্ভকর্ণের মনে ভগবান লাভের ইচ্ছা না থাকায়, তপস্যার ফলে তাহাদের নানাপ্রকার শক্তি হইল। তাহারা শক্তিলাভ করিয়া লঙ্কাদ্বীপের রাজা হইয়া ভোগসুখে দিন যাপন করিতে লাগিল। যত রাক্ষস-প্রকৃতির লোক তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল। ধনে জনে লঙ্কা-দ্বীপ সোণার লঙ্কা হইয়া উঠিল; কিন্তু মানব জীবনের সার বস্তু ধর্ম্ম সেখানে রহিল না। রাবণ অহঙ্কারে মত্ত হইয়া ধরাকে সরার মত দেখিতেন। তাহার অনুচরবর্গ ভারতে গিয়া মুনিঋষিদের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। দক্ষিণ ভারতে অত্যাচার করিতে করিতে তাহারা, বিন্ধ্যগিরি লঙ্ঘন করিয়া উত্তর ভারতেও ব্রাহ্মণ তপস্বীদের যাগযজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করিল। রাবণ এমন শক্তিশালী ছিলেন যে, তাঁহার ভয়ে কোনও রাজা সে অত্যাচারের প্রতিকার করিতে পারিলেন না। বিপন্ন, আর্ত্ত, উৎপীড়িত ও সাধুদের কাতর আহ্বান ভগবানের নিকট পৌঁছিল।

২

সূর্য্যবংশীয় রাজা দশরথ ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তাঁহার রাজধানী অযোধ্যা আজকালকার কোন সহর অপেক্ষা সৌন্দর্য্য ও পরিচ্ছন্নতায় হীন ছিল না। দেবদ্বিজে

তাঁহার অচলা ভক্তি। উপযুক্ত সময়ে তাঁহার সন্তান না হওয়াতে তিনি অনেক যাগযজ্ঞ করেন। তাহার ফলে তাঁহার চারিটি পুত্র জন্মে ; কৌশল্যার গর্ভে রাম, সুমিত্রার গর্ভে লক্ষমণ ও শত্রুঘ্ন এবং কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত।

রাম বয়সে জ্যেষ্ঠ, সৌন্দর্য্য-বল-বুদ্ধি সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ। কনিষ্ঠ ভ্রাতারা তাঁহার খুব অনুগত। উপযুক্ত বয়সে তাঁহাদের শাস্ত্র অস্ত্র সকল রকম শিক্ষার বন্দোবস্তই দশরথ করিলেন। চারি ভাই চন্দ্রকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিলেন।

বিশ্বামিত্র মুনি তপস্যা প্রভাবে সমগ্র ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, কিন্তু রাক্ষসগণ অহঙ্কারে মত্ত হইয়া তাঁহার তপোবনে নানা উৎপাত করিতে লাগিল ; এমন কি তাঁহার যজ্ঞ করা ভার হইয়া উঠিল। বিশ্বামিত্র তপোবলে জানিতে পারিলেন, সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্কর্ম্মকারীদের বিনাশের জন্য শ্রীহরি, দশরথের গৃহে মানব দেহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাই তিনি রামচন্দ্রকে রাক্ষস বিনাশের জন্য লইয়া যাইতে অযোধ্যায় আসিলেন। রাম তখন বালক মাত্র, কিন্তু বিশ্বামিত্রের ভয়ে দশরথ অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাম ও লক্ষণকে রাক্ষস বধে পাঠাইলেন। রাম লক্ষমণ তাড়কা, সুবাহু প্রভৃতি রাক্ষস বিনাশ করিয়া আশ্চর্য্য শক্তি দেখাইলেন। মায়াবী মারীচকে রাম এমন

এক বাণ মারিলেন যে সে শূন্যে ঘুরিতে ঘুরিতে সাগরে গিয়া পড়িল। তারপর বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণকে গৌতমের আশ্রমে লইয়া গেলেন। কোনও অপরাধে গৌতম স্বীয় পত্নীকে শাপ দিয়া পরিত্যাগ করেন। রামচন্দ্র তাহাকে কৃপা করিয়া শাপ মোচন করিলে গৌতম তাহাকে আবার গ্রহণ করেন। পতিতের উদ্ধারই ত অবতারের কাজ।

মিথিলা রাজ্য নিকটেই ছিল। মিথিলার রাজা জনকের সীতা নামে এক কন্যা ছিলেন। জনক রাজা এক প্রকাণ্ড ইস্পাতের ধনু তৈয়ার করিয়া ঘোষণা করেন যে, এই ধনুতে যে গুণ দিতে পারিবে, সে সীতার স্বামী হইবে। বহু রাজা, মহারাজা এই ধনুতে গুণ দিতে আসিয়া লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন। লঙ্কেশ্বর রাবণও নাকি গুণ দিতে আসিয়া ধনু একটু নোয়াইয়াছিলেন মাত্র। বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণকে মিথিলায় লইয়া গেলেন। সেই ধনুতে ছিলা দেওয়া ত সামান্য কথা, রাম ধনুখানা নুয়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। জনকের দুই মেয়ে ও তাঁহার ভাইএর দুই মেয়ের সঙ্গে রামপ্রভৃতি চারিভ্রাতার বিবাহ হইয়া গেল।

৩

রাজা দশরথ বৃদ্ধ হইয়া পড়িলেন। কাজেই রাজ্যভার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামের উপর দিতে ইচ্ছা করিলেন। অভিষেকের সব আয়োজন হইল। সমস্ত রাজ্যে উৎসব চলিল। কিন্তু সহসা এক কারণে সমস্ত আনন্দ দারুণ নিরানন্দে পরিণত হইল।

একবার দশরথ যুদ্ধে অত্যন্ত আহত হন। রাণী কৈকেয়ী বহুযত্নে তাঁহাকে আরোগ্য করেন। তখন দশরথ তাঁহাকে দুইটি বর দিতে চাহিলে কৈকেয়ী প্রয়োজন মত চাহিয়া লইবেন বলিয়াছিলেন। এখন তিনি এক বরে রামকে চৌদ্দ বছরের জন্য বনে পাঠান এবং অন্য বরে ভরতকে রাজা করিতে চাহিলেন। দশরথ সত্য রাখিবেন, কি পুত্র রাখিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া বড়ই কাতর হইলেন। রাম, ইহা শ্রবণমাত্র সন্ন্যাসীর বেশে অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সীতা ও লক্ষ্মণ চলিলেন। পুত্রশোকে দশরথের দেহত্যাগ হইল।

ভরত মাতুলালয়ে ছিলেন। তিনি বাড়ী আসিয়া এই দারুণ সংবাদে মর্ম্মাহত হইলেন। মাতাকে অনেক ভৎর্সনা করিয়া রামকে আনিবার জন্য চলিলেন। রাজ্যের যত প্রজা রামকে আনিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে

গেল। কিন্তু রাম পিতার সত্য ভঙ্গ করিতে কোনও মতে রাজী হইলেন না। অবশেষে ভরত রামের একজোড়া খড়ম লইয়া আসিলেন। সেই খড়ম সিংহাসনে রাখিয়া তিনি সন্ন্যাসীর বেশে প্রতিনিধির মত রাজ্য চালাইতে লাগিলেন।

রাম প্রথমে চিত্রকূট পর্ব্বতে গিয়া বাস করেন, পরে দণ্ডকারণ্যে গিয়া শরভঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ, অগস্ত্য প্রভৃতি শত শত মুনির সঙ্গে ধর্ম্মালোচনায় দশবৎসর যাপন করেন। মুনিগণ তাঁহার কৃপায় ঈশ্বরের দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হন। পরে তিনি পঞ্চবটী নামক খুব এক চমৎকার স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করেন।

দণ্ডকারণ্যে বিরাধ প্রভৃতি তুই চারিটি তুষ্ট লোককে তিনি সংহার করেন মাত্র। বিশেষ কোনও যুদ্ধ হয় নাই। পঞ্চবটীতে শূর্পনখা নামে রাবণের ভগিনী রাম ও লক্ষণের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করে। তেজস্বী লক্ষ্মণ বিরক্ত হইয়া শূর্পনখার নাক ও কাণ কাটিয়া দেন। এই লইয়া রাবণের সঙ্গে বিবাদ হয়। রাবণ একদিন গোপনে আসিয়া সীতাকে ধরিয়া লইয়া যায়।

রাম লক্ষ্মণ বনে সীতাকে খুঁখিতে খুঁজিতে সুগ্রীব ও হনুমানের সঙ্গে সঙ্গে মিলিত হন। প্রথম দেখা মাত্রই সুগ্রীব ও হনুমান রামের প্রতি খুব অনুরক্ত হইয়া

পড়েন। সুগ্রীবের ভাই বালী কিষ্কিন্ধ্যার রাজা। কোনও কারণে উভয়ে বিবাদ হওয়ায় বালী সুগ্রীবকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেয়। সুগ্রীব সেই হইতে বনে বনে হনুমানাদি কয়েকজন বন্ধুসহ ঘুরিয়া বেড়ান। রামের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব হইল। রাম প্রতিজ্ঞা করিলেন, তিনি বালীকে মারিয়া সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা করিবেন; সুগ্রীব প্রতিজ্ঞা করিলেন, সীতার সন্ধান বাহির করিয়া তাঁহাকে রামের নিকট আনিয়া দিবেন।

রাম বালীকে মারিয়া সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা করিয়া দিলেন। সুগ্রীব বানরবংশের শত শত লোককে সীতার সন্ধানে চারিদিকে পাঠাইলেন।

বহু অনুসন্ধানের পর হনুমান লঙ্কাদ্বীপে গিয়া সীতাকে দেখিয়া আসিয়া খবর দিলেন। তখন রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব বানরসৈন্য লইয়া লঙ্কা আক্রমণ করিলেন। বানর দক্ষিণা পথের এক পার্ব্বত্য জাতি। ইহারা ধনুদ্বারা যুদ্ধ করিতে জানিত না। গায়ে অসম্ভব জোর ছিল। পাতর ও গাছের ডাল ছুঁড়িয়া শত্রু মারিত। অসংখ্য বানর লঙ্কা ঘিরিয়া ফেলিল। বিভীষণ খুব ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি রাবণকে রামের সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে পরামর্শ দেন। রাবণ ইহাতে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বিভীষণকে লাথি মারিয়া সভা হইতে তাড়াইয়া দেয়।

অপমানিত বিভীষণ রামের পক্ষে যোগদান করেন। দশ মাস যুদ্ধের পর রাবণের পক্ষে পুরুষ মানুষ কেহই বাঁচিয়া রহিল না। সীতার উদ্ধার হইল। বিভীষণ লঙ্কার রাজা হইলেন।

চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ণ হওয়ায় রাম অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। অযোধ্যায় আনন্দের স্রোত বহিয়া গেল। অযোধ্যা স্বর্গরাজ্য পরিণত হইল। এখনও লোকে বলে 'রামরাজ্য'। স্বয়ং ভগবান রাজা হইলে, সে রাজ্যই ত বৈকুণ্ঠ।

৪

কিন্তু সুখের সঙ্গে দুঃখ থাকেই থাকে। দুষ্ট লোক বলিতে লাগিল, "যে স্ত্রী এক রাক্ষসের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছিল, রাম তাহাকে আনিয়া কেন আবার পাটমহিষী করিলেন?" এই কথা রামের কাণে গেল। রাম প্রজাদিগকে খুসী করিবার জন্য প্রাণের অপেক্ষা প্রিয় সতী সাধ্বী সীতাকে বাল্মীকির তপোবনে পাঠাইয়া দিলেন। তখন সীতা গর্ভবতী ছিলেন তপোবনে দুইটি জমজ সন্তান জন্মে। বাল্মীকি ইহাদের নাম রাখেন লব ও কুশ। তিনি অতি যত্নে ইহাদিগকে পালন করিয়া যথারীতি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বাল্মীকি মুনি রামের

বিষয়ে এক কাব্য লিখেন এবং লব ও কুশকে সেই কাব্য সুর করিয়া গাহিতে শিক্ষা দেন।

রাম এক যজ্ঞ করেন, সেই উপলক্ষে অযোধ্যায় এক উৎসব হয়। লব ও কুশ রাজসভায় রামায়ণ গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করিলেন। তখন গান বাজনার এত উন্নতি হয় নাই। বালকের মুখে রামায়ণ গান তখনকার লোকের নিকট অতি আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল। ছেলে দুটিকে নিয়া হুলস্থূল পড়িয়া গেল। তাহাদের পরিচয় আর গোপন রহিল না। রাম সীতাকে বাল্মীকির তপোবন হইতে আনাইলেন। সীতা রামকে দর্শন করিয়া সমাধি-যোগে লীলা সম্বরণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

একদিন এক তপস্বী আসিয়া রামকে বলিলেন যে, তাঁহার একটি গোপনীয় কথা রামের নিকট বলিবার ইচ্ছা; কিন্তু কাহারও সাক্ষাতে সে কথা হইতে পারেন না, যদি কোনও লোক আলাপের সময় আসিয়া পড়ে তাহাকে বধ বা ত্যাগ করিতে যদি রাম সম্মত হন, তবে তপস্বী কথাটি বলিতে পারেন। রাম তাহাতে সম্মত হইয়া লক্ষ্মণকে পাহারায় নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মহা-ক্রোধী দুর্ব্বাসা মুনি আসিয়া তখনি রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। মহা বিপদ! দুর্ব্বাসাকে চটাইলে হয় ত রাজ্য শুদ্ধ সকলকে অভিশাপ দিবেন। কাজেই

'নিজের যা হয় হবে' ভাবিয়া লক্ষ্মণ, তপস্বীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই রামের সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন। কাজেই রাম লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইলেন। লক্ষ্মণ সরযূনীরে প্রবেশ করিয়া সমাধিযোগে বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেলেন।

সীতা ও লক্ষ্মণের শোকে রাম, ভরত ও শত্রুঘ্ন সকলেই মানব দেহ ত্যাগ করিলেন। অযোধ্যার লোক রামকে এত ভালবাসিত যে অনেকে রামকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিল না। রামের চিন্তায় দেহ ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে গেল, কারণ রাম পূর্ণব্রহ্ম ভগবান।

হলী রাম চরিত।

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং
হলমতি-ভীতি-মিলিত-যমুনাভম্।
কেশব ধৃত-হলধর রূপ
জয় জগদীশ হরে॥

১

এ জগতে কিছুই বেশী দিন থাকে না। রামরাজ্যও কিছুদিন পরে স্বপ্ন রাজ্যে পরিণত হইল। রাজগণ স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা পরস্পর কলহ করিয়া প্রজাগণের সর্ব্বনাশ করিতে লাগিলেন। শাস্ত্রের নিয়ম উঠিয়া গেল, তাহার স্থানে নানা কুৎসিত লোকাচার প্রচলিত হইল। লোক অন্ধের ন্যায় সেই সব নিয়ম পালন করিয়া অধঃপাতে যাইতে লাগিল; বড় বড় পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক লোক পর্য্যন্ত সেই সব নিয়মের হাত হইতে রক্ষা পাইলেন না। সমাজে, পরিবারে, ধর্ম্মে মানুষের কোন স্বাধীনতা রহিল না।

যুধিষ্ঠিরের মত ধার্ম্মিক লোক, জুয়া খেলায় নিজের ভাই ও স্ত্রীকে টাকা কড়ির ন্যায় পণ রাখিয়াছিলেন। সভা মধ্যে রাণী দ্রৌপদীকে উলঙ্গ করিবার চেষ্টা হইল;

ভীষ্ম দ্রোণ ভীম অর্জ্জুন একটু প্রতিবাদ করিবারও সাহস করিলেন না ; অথচ তাঁহারা ভারত-বিখ্যাত বীর পুরুষ। যদুবংশীয়গণ মাতাল অবস্থায় একে অন্যকে বধ করিলেন। এই সব ঘটনা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় সমাজে কি পরিমাণ দুর্নীতি প্রচলিত ছিল।

মানুষকে শান্তির পথ দেখাইতে এবার শ্রীহরি রাম ও কৃষ্ণরূপ ধারণ করিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে দশাবতার মধ্যে গণনা করা হয় না, বলরামকেই শুধু অবতার বলা হয়। যদিও উভয়ের লীলা অভেদ, তথাপি আমরা যথা সাধ্য প্রচলিত মতের অনুসরণ করিব।

২

ভোজবংশে অভিজিত রাজার পুত্র আহুক খুব প্রতাপ-শালী রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র, দেবক ও উগ্রসেন। রাম-কৃষ্ণের মাতা দেবকী দেবকের কন্যা। যদুবংশীয় বসুদেবের সঙ্গে দেবকীর বিবাহ হয়। উগ্রসেনের পুত্র কংস পিতাকে বন্দী করিয়া নিজে রাজা হইল। তাহার কদাচার ও অত্যাচারের সকলেই উত্যক্ত। দেবকীর বিবাহ সময়ে দৈববাণী হইল যে, ইহার অষ্টম গর্ভের সন্তান কংসকে বধ করিবে। কংস ইহা শুনিবামাত্র দেবকীকে বধ করিতে গেল। বসুদেব অতিকষ্টে তাহাকে

নারীহত্যা হইতে নিবৃত্ত করিলেন এবং তাহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন, ইহার গর্ভের সকল সন্তান কংসের হাতে সমর্পণ করিবেন। তথাপি কংস ভগিনী ও ভগিনীপতিকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিল।

বসুদেবের রোহিণী নামে আর এক পত্নী ছিলেন। বসুদেব কারাগারে, কাজেই রোহিণী অসহায় অবস্থায় স্বামীর পরমবন্ধু নন্দগোপের আশ্রয়ে ব্রজে বাস করিতে লাগিলেন। দেবকীর গর্ভে একে একে ছয়টি সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। কংস জন্মমাত্রই প্রত্যেকটিকে হত্যা করিল। সপ্তম গর্ভের সন্তান দৈব উপায়ে রোহিণীর নিকট প্রেরিত হয়। সকলে জানিল যে, সপ্তমমাসে দেবকীর গর্ভ নষ্ট হইয়াছে। সেই সন্তানই তৃতীয় রাম। দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেব অতি কৌশলে নন্দের স্ত্রী যশোদার গর্ভজাত এক কন্যার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলেন। কংস সেই কন্যাকে হত্যা করিয়া ভগিনীও ভগিনীপতিকে মুক্তিদান করিল।

রাম-কৃষ্ণ নন্দের সন্তানরূপে পালিত হইতে লাগিলেন। শিশুকালেই তাঁহাদের চরিত্রে অসাধারণত্ব ফুটিতে লাগিল। কৃষ্ণের বর্ণ ছিল কাল এবং রাম ছিলেন গৌরবর্ণ। দেখিতে অত্যন্ত সুশ্রী, অসাধারণ বলশালী এবং বুদ্ধি ও

ব্যবহারে বিজ্ঞ বলিয়া গোপগোপীগণ তাঁহাদিগকে নিজের সন্তানের চেয়েও অধিক ভালবাসিত। ব্রজের বালকগণ ক্ষণকালও ইঁহাদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। গোচারণ উপলক্ষে নিত্যনূতন খেলা ও আমোদ বাহির করিয়া তাঁহারা রাখালগণকে আমোদিত করিতেন। বনে নানাপ্রকার হিংস্র জন্তু ছিল, রাম-কৃষ্ণ সেই সব জন্তু সংহার করিয়া ব্রজভূমি নিরাপদ করেন। বহুকাল বাসের ফলে ব্রজভূমিতে আর ভাল ঘাস পাওয়া যাইতেছিল না। এই সময় আবার নেকড়ে বাঘের উপদ্রব হয়। চারিদিকের বনভূমির অবস্থা রাম-কৃষ্ণের বেশ জানা ছিল। তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন, যমুনা তীরে বৃন্দাবন নামে একটি স্থান আছে, তাহা দেখিতে যেমন চমৎকার, ঘাস তথায় তেমনি প্রচুর; সেখানে চলিয়া গেলে গোপগণের সব বিষয়েই সুবিধা।' রাম-কৃষ্ণের উৎসাহে ব্রজবাসিগণ বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। এইরূপে সব বিষয়েই তাঁহারা নূতনত্ব ও উন্নতি দেখাইয়া গোপজাতির ভিতর নবজীবন সঞ্চার করিলেন।

একদিন বনের ভিতর গরু চরিতেছে, রাখালগণ খেলায় মগ্ন। এমন সময় দাবানল জ্বলিয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে বাতাসের সহায়ে আগুন চারিদিক্ ছাইয়া ফেলিল। গরুগুলি ভীত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া বিপদ

আরো বাড়াইয়া তুলিল। রাম-কৃষ্ণ, অসীম সাহস ও ধৈর্য্যসহকারে গরু ও রাখালগণকে সমবেত করিয়া ধীরে ধীরে সুশৃঙ্খলভাবে বন হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

বৃন্দাবনের নিকটে একটি হ্রদ ছিল। তাহাতে কতকগুলি বিষধর কালসাপ বাস করিত এবং গোচারণ সময় গরু বা রাখাল সে দিকে গেলে দংশন করিত। রাখালদের সাহায্যে রাম-কৃষ্ণ সর্পগুলি মারিয়া অসীম সাহস প্রদর্শন করেন। প্রলম্ব ও ধেনুক নামক দুইটি বন্যজন্তু বলরাম একাকী বধ করেন। পুরাণে অনেক অসুর বধের কথা আছে, কিন্তু তাহা এমন অদ্ভুত ও অসম্ভব যে, তাহা বিশ্বাস করা যায় না। মোট কথা রাম-কৃষ্ণ বাল্যকালেই এমন বলবুদ্ধি ও সাহস দেখাইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের সম্বন্ধে অনেক অবাস্তব অদ্ভুত ঘটনা লোকে কল্পনা করিয়াছিল।

৩

শান্তপ্রকৃতি গোপকুলের নবজাগরণ ও রাম-কৃষ্ণের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি কাহিনী নানারূপে অতিরঞ্জিত হইয়া কংসের নিকট পৌঁছিল। তাহার প্রতাপে পশ্চিম ভারত কম্পিত। বাড়ীর কাছে গোপগণ জাগিয়া উঠিতেছে এ সংবাদ তাহার নিকট বিষবৎ বোধ হইল। দেবকীর

সকল সন্তানই ত সে স্বহস্তে সংহার করিয়াছে, এ ছেলে দুইটি আবার কোথা হইতে আসিল!! নানাপ্রকার সন্দেহে তাহার মন আন্দোলিত, ঈর্ষায় দগ্ধ হইতে লাগিল। গোপগণের গর্ব্ব খর্ব্ব না করিলে তাহার শান্তি নাই। কিন্তু সে পিতাকে বন্দী করিয়াছে, ভগিনীর সন্তান হত্যা করিয়াছে, শত উপায়ে মানুষের উপর অত্যাচার করিয়া কাহাকেও মিত্র রাখে নাই। অত্যাচারীর মন বড় দুর্ব্বল। কংস প্রকাশ্যভাবে নির্দ্দোষ গোপগণের শত্রুতা করিতে সাহস পাইল না। সে এক কৌশল অবলম্বন করিল।

কংস একটি যজ্ঞ করিবার আয়োজন করিতে লাগিল। বৃন্দাবনের গোপগণ তাহার প্রজা। যজ্ঞ উপলক্ষে করস্বরূপ দধিদুগ্ধ লইয়া আসিতে সে তাহাদিগকে আদেশ দিল। অক্রুর সেই সংবাদ জানাইতে প্রেরিত হইলেন। কংস অক্রুরকে গোপনে বলিয়া দিল যে, ছলে কৌশলে রাম-কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া আসিতে হইবে। অক্রুর যে কংসের বন্ধু ছিলেন তাহা নহে, তিনি সব কথাই রাম-কৃষ্ণকে জানাইলেন। তাঁহাদের বয়স তখন ষোল বৎসরেরও কম।

নন্দ প্রভৃতি গোপগণ রাজার আদেশে দধিদুগ্ধ লইয়া মথুরায় গেলেন। রাম-কৃষ্ণ, রাখালদল সহ উৎসব দেখিতে তাঁহাদের অনুগমন করিলেন। তাঁহারা রাজধানীতে গিয়া

ডাকাতদের ন্যায় লুটপাট আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের সৌন্দর্য্য, সাহসিকতা নাগরিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। মালী নানাপ্রকার ফুল ও মালা লইয়া রাজবাড়ীতে যাইতেছিল। তাঁহারা মালীর নিকট হইতে তাহা কাড়িয়া লইয়া নিজেরা পরিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। ধোপা রাজার কাপড়চোপড় পোষাক পরিচ্ছদ লইয়া যাইতেছে, ইঁহারা লুটিয়া লইয়া নিজেরা তাহা পরিলেন। ছেলে দুইটির কি অসীম সাহস! যে কংসের ভয়ে সকলে সন্ত্রস্ত, ইঁহারা তাহার রাজধানীতে তাহারই জিনিসপত্র কাড়িয়া লইতেছেন!। অবশ্য কংসের নিকট সকল সংবাদই গেল। কংস হিংসায় পাগল হইয়া উঠিল।

উৎসব উপলক্ষে রাজসভায় নানা আমোদের বন্দোবস্ত ছিল। কংস সদর দরজায় কুবলয়াপীড় নামক পাগলা একটা হাতী রাখিল, রাম-কৃষ্ণকে আমোদ দেখাইবার জন্য ভুলাইয়া সেই দরজায় লইয়া আসিতে লোক নিযুক্ত করিল। মাহুতকে বলিয়া দিল, হাতীকে যেন তাঁহাদিগের দিকে রুখাইয়া দেয়। যদি বা তাঁহারা কোন কারণে হাতীর নিকটে রক্ষা পান, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে মারিবার আর এক ব্যবস্থা করিল। তাহার সভায় অনেক পালোয়ান ছিল, তাহাদের মধ্যে চানুর ও মুষ্টিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সে তাহাদিগকে বলিল, রাম-কৃষ্ণ সভায় আসিবামাত্র

'কুস্তি' বাধাইয়া ইঁহাদিগকে মারিয়া ফেলিতে হইবে। তের চৌদ্দ বছরের দুইটি ছেলেকে মারিবার জন্য বন্দোবস্তটি খুব পাকা বটে !

রাম-কৃষ্ণ আমোদ দেখিতে রাজসভায় চলিলেন। সিংহদ্বারে কুবলয়াপীড় তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। অসীম বলশালী রাম চক্ষের নিমিষে হাতীর পিছনে গিয়া তাহার লেজ ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। টান খাইয়া হাতী প্রাণপণে সম্মুখে অগ্রসর হইতে চাহিলে রাম চট্ করিয়া ছাড়িয়া দিলেন, আর অমনি হাতী হুমড়ী খাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। কৃষ্ণ সম্মুখে ছিলেন, তিনি এক লাফে হাতীর মাথায় চড়িয়া এমন লাথি মারিতে লাগিলেন যে, তাহার মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া গেল। ইতিমধ্যে রামও ছুটিয়া আসিয়া হাতীর দাঁত দুইটি উপড়াইয়া দুই হাতে খোঁচাইতে লাগিলেন। হাতী ভয়ানক চীৎকার করিতে লাগিল, রক্তে তাঁহারা স্নান করিলেন, চারিদিকে শত শত লোক জমিয়া ভয়ানক কোলাহল করিতে লাগিল। হাতী মরিয়া গেল।

ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা সহরে হুলস্থূল বাধাইয়াছিলেন। এই ঘটনায় রাজসভার সকল লোকের দৃষ্টি তাঁহাদের দিকে আকৃষ্ট হইল। তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য সকলে ছুটিয়া আসিল। শত শত লোক তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া

শত শত প্রশ্ন করিতে লাগিল। একজন কৃষ্ণবর্ণ এবং একজন গৌরবর্ণ হইলেও উভয়েই রক্তে লাল, হাতে হাতীর দাঁত, মালকোচা করিয়া কাপড় পরা এই অবস্থায় শত শত নাগরিক কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহারা সভায় প্রবেশ করিলেন। বালকগণের মনোহর মূর্ত্তি ইহাতে আরও মনোহর হইয়া সকলের হৃদয়ে স্নেহেরই সঞ্চার করিল। কিন্তু দুষ্ট কংস ইঁহাদিগকে যমের ন্যায় ভীষণ বোধ করিতে লাগিল। সে কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

চানুর কৃষ্ণকে এবং মুষ্টিক বলরামকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিল। ইহারা ভীমকায় ও কুৎসিৎ, রাম-কৃষ্ণ বালক কোমল দেহ ও খুব সুশ্রী। কাজেই এই অসমান দ্বন্দ্বে সকলের সহানুভূতি রাম-কৃষ্ণের দিকে রহিল। অনেকক্ষণ যুদ্ধ চলিল, কিন্তু অবশেষে চানুর ও মুষ্টিক উভয়কেই আশ্চর্য্য কৌশলে ইঁহারা মারিয়া ফেলিলেন।

চানুরও মুষ্টিক হত হওয়ায় কংস ভয়ে মৃতবৎ হইয়া গেল। কৃষ্ণ হঠাৎ লাফ দিয়া মঞ্চের উপর উঠিল, মুষ্ট্যাঘাতে কংসের মাথার মুকুট ফেলিয়া দিয়া তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া সিংহাসন হইতে মাটিতে ফেলিয়া ভয়ানক লাথি, কীল, ঘুষি মারিতে লাগিলেন। কংস সিংহাসন পার্শ্বে কৃষ্ণকে দেখিয়াই বিহ্বল হইয়া গিয়াছিল,

সে নড়িলই না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঘটনায় সভাস্থ সকলের মনে রাম-কৃষ্ণ এক অভূতপূর্ব্ব ভাবোদয় করিয়াছিলেন, এই অসম্ভব ঘটনায় তাহারা স্তম্ভিত হইয়া রহিল, একটু শব্দও করিল না। অবশেষে কৃষ্ণের ভীষণ পদাঘাতে রক্ত বমন করিতে করিতে জিহ্বা বাহির করিয়া কংস যখন মরিয়া গেল, আর সেই সংবাদ পাইয়া নারীগণ অন্তঃপুর হইতে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, তখন সকলের যেন চমক ভাঙ্গিল। ততক্ষণে রাম-কৃষ্ণ বসুদেবের চরণে প্রণাম করিলে তিনি, তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া অন্যান্য আত্মীয়গণের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিতে লাগিলেন। সভাসদ্‌গণের অনেকেই ইতিপূর্ব্বে রাম-কৃষ্ণের পরিচয় পাইয়াছিলেন। রাম-কৃষ্ণ নগরে নানা উপদ্রব আরম্ভ করিলে একটা কিছু ঘটিবে ভাবিয়া বসুদেব পুত্রদ্বয়ের বিষয় প্রায় সকল প্রধান ব্যক্তিকেই জানাইয়াছিলেন। কংসকে কেহই ভালবাসিত না। কাজেই এখন সকলে রাম-কৃষ্ণকে মন খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

রাম-কৃষ্ণ রাজা উগ্রসেনকে কারামুক্ত করিয়া দিলেন। তিনি মথুরার রাজা হইলেন। রাম-কৃষ্ণ এতকাল গোপ-গৃহে ছিলেন। তাঁহাদের শারীরিক শিক্ষা বেশ হইয়াছে, কিন্তু ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ন, বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি হয় নাই। বসুদেব মহর্ষি গর্গের দ্বারা উপনয়ন সংস্কার করাইয়া

কাশীর নিকটবর্ত্তী অবন্তী নগরে সন্দিপনী মুনির নিকট বেদাধ্যয়নার্থ তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা শ্রুতিধর ছিলেন, অল্পদিবস মধ্যেই সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া গৃহে ফিরিলেন।

উগ্রসেন রাজা হইলেও রাম-কৃষ্ণই কার্য্যতঃ রাজ্য চালাইতে লাগিলেন। মগধের রাজা জরাসন্ধ ছিলেন কংসের শ্বশুর। জামাতা বধের প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি মথুরা অবরোধ করিলেন; কিন্তু রাম-কৃষ্ণের বীরত্বে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। রাম-কৃষ্ণ যদুবংশীয় যুবকগণকে সমবেত করিয়া যুদ্ধ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। জরাসন্ধও বার বার বেশী বেশী সৈন্য লইয়া মথুরা আক্রমণ করিলেন। এইরূপ সপ্তদশবার তিনি যুদ্ধ করিতে আসিলেন, কিন্তু প্রতিবারেই পরাজিত হইয়া পলাইতে বাধ্য হইলেন।

রাম-কৃষ্ণ দেখিলেন জরাসন্ধের যত ক্রোধ তাঁহাদেরই উপর। তাঁহারা মথুরায় থাকিলে জরাসন্ধ যুদ্ধ হইতে বিরত হইবেন না। যাদবগণ যুদ্ধ করিয়া শ্রান্ত, কোষ অর্থশূন্য, দুর্গ ভগ্ন। এই অবস্থায় আর যুদ্ধ করা চলে না। অতএব তাঁহাদের মথুরায় আর থাকা উচিত নহে, এই ভাবিয়া তাঁহারা দুইজন মথুরা ত্যাগ করিয়া দক্ষিণাপথে চলিয়া গেলেন।

তখনকার দিনে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, সংবাদপত্র ত ছিল না। বহু কষ্টে দূতমুখে এক দেশের খবর আর দেশে পৌঁছিত। রাম-কৃষ্ণ ভাবিলেন, জরাসন্ধ আর তাঁহাদের সংবাদ পাইবেন না। কিন্তু জরাসন্ধ ভয়ানক চতুর লোক, তাঁহার দূতগণও তদ্রূপ। তাহারা রাম-কৃষ্ণের সকল সংবাদই সংগ্রহ করিয়া জরাসন্ধকে দিল। জরাসন্ধ, মিত্ররাজগণের সম্মিলিত অগণিত সৈন্যসহ দক্ষিণাপথে অভিযান করিলেন। রাম-কৃষ্ণের পিসা চেদীপতি এই সব সংবাদ পাইয়া বড়ই চিন্তিত হইলেন, এবং তাঁহাদের সাহায্যের জন্য একদল বাছা বাছা সৈন্য লইয়া নিজে জরাসন্ধের পাছে পাছে যাত্রা করিলেন।

রাম-কৃষ্ণ গোমন্ত নামক পার্ব্বত্য প্রদেশে ছিলেন। জরাসন্ধ সেই রাজ্য আক্রমণ করিলেন। সমতলবাসী যোদ্ধার পক্ষে পার্ব্বত্য প্রদেশে যুদ্ধ করা ভয়ানক কঠিন, আর, অপরিচিত স্থান হইলে ত একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু মূর্খ, অহঙ্কারী জরাসন্ধ সৈন্য লইয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। রাম-কৃষ্ণ সেই দেশের সবই চিনিয়া জানিয়া লইয়া ছিলেন। চেদীপতির সাহায্যে তাঁহারা জরাসন্ধ ও তাঁহার বন্ধুরাজগণকে এমন শিক্ষা দিলেন যে, তাঁহারা জনকয়েক কোনওরূপে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইলেন; সৈন্য, তাম্বু, রথ, রসদ, অস্ত্র কিছুই ফিরিয়া গেল না।

বলরামের শান্ত-সরল-নিরহঙ্কার স্বভাব দেখিয়া তাঁহার বীরত্বের বিষয় বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু যুদ্ধস্থলে যখন অবলীলাক্রমে রুক্মীকে বধ করিয়া তিনি তাহাদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন, তখন সকলেই ভয়ে পলায়ন করিল।

কন্যা হরণ করিয়া বিবাহ করা ক্ষত্রিয়দের বড় গৌরবের বিষয়। কারণ তাহাতে খুব বীরত্ব প্রকাশ পায়। দুর্য্যোধন, কন্যা লক্ষণার বিবাহ উপলক্ষে এক স্বয়ংবর সভার আহ্বান করেন। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব লক্ষণাকে হরণ করেন। কিন্তু রাজগণ মিলিত হইয়া শাম্বকে ধরিয়া ফেলেন। রাম শাম্বকে উদ্ধার করিতে গেলে রাজগণ ভয়ে শাম্বকে ছাড়িয়া দিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন তাহাতে সম্মত হইলেন না। রামের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিল। গদা ও লাঙ্গলাস্ত্র সহ রাম যখন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, তখন হস্তিনানগর রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল। সৈন্য সংহার করিয়া রাম লাঙ্গলাস্ত্রে দুর্গ প্রাচীর উপড়াইয়া ফেলিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন ভয়ে শাম্ব ও কন্যা লক্ষণাকে তাঁহার হাতে সঁপিয়া দিলেন, এবং গদাযুদ্ধ শিক্ষার অভিলাষে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। আশুতোষ রাম, তাঁহার উপর অত্যন্ত প্রীত হইয়া প্রাণ খুলিয়া তাঁহাকে এমন শিক্ষা দিলেন যে, দুর্য্যোধন, গুরুর ন্যায় গদাযুদ্ধে অজেয় হইলেন।

সুভদ্রা নামে রামের এক ভগিনী ছিলেন। রাম প্রিয় শিষ্য দুর্য্যোধনকে সেই কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু কৃষ্ণ দুর্য্যোধনকে সুভদ্রার উপযুক্ত বিবেচনা করিতেন না। একদা অর্জ্জুন ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহাদের নিকট আসিয়া কিছুকাল বাস করেন। কৃষ্ণের ইঙ্গিতে একদিন তিনি সুভদ্রাকে লইয়া পলায়ন করেন। ইহাতে রাম ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জ্জুনকে ধরিয়া আনিবার জন্য যাদব সৈন্যকে আদেশ দিলেন। যাদবগণ অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন। সুভদ্রা সারথির ন্যায় অর্জ্জুনের রথ চালাইতেছেন দেখিয়া তাঁহারা আর যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন না। কৃষ্ণেরও এই বিষয়ে সম্মতি আছে বুঝিতে পারিয়া রামের ক্রোধ ক্ষণকালেই চলিয়া গেল। যুদ্ধের উদ্যম বিবাহোৎসবে পরিণত হইল।

রামের হৃদয় অত্যন্ত কোমল ছিল। কৃষ্ণ তাহা খুব জানিতেন, তাই মাঝে মাঝে তাঁহাকে ক্ষেপাইয়া মজা দেখিতেন। রাম হাজার রাগিলেও কাহারও কোনও কষ্ট হইতেছে দেখিলে তৎক্ষণাৎ গলিয়া যাইতেন। শ্রীকৃষ্ণকে তিনি এত ভালবাসিতেন যে, কোন বিষয়ে তাঁহাকে বিন্দুমাত্রও বিরক্ত করিতে তিনি ইচ্ছা করিতেন না। সমস্ত জীবন যুদ্ধ করিয়া কাটাইলেন কিন্তু, তিনি

যুদ্ধ ভালবাসিতেন না। অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখিতে পারিতেন না, বিশেষতঃ অন্যায়ের প্রতীকার করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, তাই কর্ত্তব্যবোধে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইত।

৬

কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ সম্ভাবনার কথা শুনিয়া রাম বড়ই ব্যথিত হইলেন। কৃষ্ণ বিবাদ মিটাইতে হস্তিনায় গেলেন। রাম ভাবিলেন, এমন বিচক্ষণ ভাই নিশ্চয় বিবাদ মীমাংসা করিয়া ফিরিবে। কিন্তু দুর্য্যোধনের যুদ্ধ করিবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা, কিছুতেই সে মীমাংসা করিতে সম্মত হইল না। শ্রীকৃষ্ণ বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। দুর্য্যোধন রামের উপযুক্ত শিষ্য। তাই রাম দুর্য্যোধনকে বড় ভালবাসিতেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কথায়ও সে যখন বিরত হইল না, তখন তিনি বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন। সম্মুখে থাকিয়া এই আত্মকলহ দর্শন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তাই তিনি তীর্থ যাত্রার ছলে দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

তীর্থ দর্শন করিতে করিতে রাম নৈমিষারণ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ঋষিরা তথায় এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। সেই উপলক্ষে সূত জাতীয় ব্যাসশিষ্য

রোমহর্ষণকে ব্যাসের আসনে বসাইয়া তাঁহারা পুরাণ শ্রবণ করিতেছিলেন। রাম তথায় উপস্থিত হইলে মুনিগণ তাঁহাকে যথারীতি অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু রোমহর্ষণ স্থির হইয়া আসনে বসিয়া রহিলেন। রাম তাঁহার আস্পর্দ্ধা দেখিয়া ক্রোধে এক আঘাত করাতে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল। ঋষিগণ হায় হায় করিয়া উঠিলেন। রাম কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন যে, ব্যাসের আসনে বসিলে কাঁহাকেও অভিবাদন করিবার নিয়ম নাই। রাম বড় অনুতপ্ত হইলেন এবং এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিলেন। মুনিগণ বলিলেন, তাঁহার ব্রহ্মহত্যার পাপ হইয়াছে, ভারতের সমুদয় তীর্থ ভ্রমণই ইহার প্রায়শ্চিত্ত।

বিধাতার বিধান লঙ্ঘন করা যায় না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যেরূপ অন্যায় নিষ্ঠুরতা হইয়াছিল বলদেব রাম সেখানে উপস্থিত থাকিলে তাহা হইতে পারিত না। কিন্তু রাজগণের চরিত্র যুদ্ধক্ষেত্রে প্রকাশ না পাইলে মানব জাতির শিক্ষা হইত না, ক্ষত্রিয়গণ যে কত কলুষিত হইয়াছিলেন তাহা বুঝা যাইত না, ভয়ে উভয় পক্ষ যুদ্ধে বিরত হইতেন কিন্তু ভিতরে ভিতরে যত পাপ থাকিয়া যাইত। ভগবানের করুণার অবতার রামের পক্ষে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যোগ দেওয়া সম্ভব নহে তাই ভগবান তাঁহাকে কৌশলে সরাইয়া

দিলেন। সমস্ত ভারতের রাজগণ এই যুদ্ধে যোগদান করিবেন এবং এত অল্প দিনে সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইবে ইহা কেহ ভাবিতেও পারে নাই।

বলদেব তীর্থ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অল্প দিনেই যুদ্ধ সম্বন্ধে ভয়ানক সংবাদ পাইয়া বিচলিত হইয়া উঠিলেন। একে যুদ্ধের অবস্থা অতি ভীষণ ও বীভৎস তাহাতে সংবাদ অতিরঞ্জিত হইয়া তাঁহার নিকট পৌঁছিল। প্রভাস তীর্থে যাইতে না যাইতে তিনি শুনিলেন, ক্ষত্রিয়বর্ণ ধ্বংস হইয়াছে, এখনও দুর্য্যোধন জীবিত আছে, নারায়ণী সেনা প্রভৃতি সবই নিহত। আতঙ্কে মন পূর্ণ হইয়া উঠিল, রাম কুরুক্ষেত্রে ছুটিয়া আসিলেন। তখন ভীম ও দুর্য্যোধনে যুদ্ধ হইতেছে।

কি বীভৎস দৃশ্য! ভীম ও দুর্য্যোধন, হিংসায় পশুর মতন উভয়ে উভয়কে আক্রমণ করিয়াছেন। উভয়েই মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন। দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে অদ্বিতীয়, ভীম হারিয়া যাইতেছেন। এমন সময় ভীম দুর্য্যোধনের উরুতে গদাঘাত করিলে, উরু ভাঙ্গিয়া গেল, দুর্য্যোধন মাটিতে পড়িলেন; ভীম তাঁহার মাথায় পদাঘাত করিতে লাগিলেন। গদাযুদ্ধে নাভির নীচে আঘাত করিবার নিয়ম ছিল না, পতিত শত্রুকে অপমানিত করা ততোধিক অন্যায়। রাম, ক্রোধে অগ্নিবৎ হইয়া লাঙ্গল হস্তে

ভীমকে আক্রমণ করিতে ছুটিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে ধরিয়া নিবারণ করতঃ পূর্ব্বের ঘটনা সমূহ বলিতে লাগিলেন,—"এই দুর্য্যোধন নিজ কুলের রমণী রাণী দ্রৌপদীকে সভাস্থলে উলঙ্গ করিতে চেষ্টা করে, বার বার তাহার উরুতে গিয়া বসিতে দ্রৌপদীকে বলে ; তাই ভীম প্রতিজ্ঞা করেন যে, দুর্য্যোধনের উরু একদিন তিনি ভঙ্গ করিবেন। উরুতে আঘাত করিয়া ভীম প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন মাত্র।" আর বলিতে হইল না রামের সকল কথাই মনে পড়িল, তিনি বুঝিলেন, কুরুক্ষেত্রের জটিল ঘটনা নিচয়ে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যের মতি স্থির রাখা, কর্ত্তব্য নির্ণয় করা অসম্ভব। এই ভীষণ স্থানে ক্ষণকালও থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না, তিনি তৎক্ষণাৎ কুরুক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন।

৭

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ একাকী যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যোগ দেন। যদুবংশীয় 'নারায়ণী সেনা' নামক একদল সুশিক্ষিত বীর যোদ্ধা দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করেন। কাজেই যদুবংশের প্রধান প্রধান অনেক বীর, কুরুক্ষেত্রে যোগ না দেওয়াতে, বাঁচিয়া রহিয়াছিলেন। রাম-কৃষ্ণের সঙ্গে থাকিয়া বহু যুদ্ধ করায় যুদ্ধবিদ্যায় ইঁহাদের অসাধারণ

অভিজ্ঞতা ছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ভারতে আর যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন রহিল না, কাজেই বিনা কাজে যদুবীরগণের সময় কাটান ভার হইয়া উঠিল। মদ্যমাংস ছিল ইঁহাদের নিত্য খাদ্য, দম্ভ অহঙ্কার চরিত্রের ভূষণ। তাঁহারা দিনরাত্র মদ খাইয়া তর্ক ঝগড়া জুয়াখেলা লইয়া মাতিয়া থাকিতেন। কুরুক্ষেত্রের মত এমন একটা যুদ্ধে যোগ দিতে না পারায় ইহাদের মনে বড় একটা আপশোষ ছিল। একটা যুদ্ধ বিবাদের জন্য তাঁহারা তৃষিত হইয়া উঠিতেছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর রাম-কৃষ্ণ সব বিষয়ে উদাসীন। ইঁহারা রাম-কৃষ্ণের ভয়ে তবু একটু শান্ত থাকিতেন। এখন তাঁহারা নিশ্চেষ্ট থাকাতে ইঁহারা ক্ষেপিয়া উঠিতে লাগিলেন।

রাম-কৃষ্ণ দেখিলেন এই রণপ্রিয় জাতিকে সামলাইয়া রাখা দায়। কোনও রূপ উৎসব আমোদে মাতাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে ইঁহাদিগকে লইয়া প্রভাস তীর্থ দর্শনের পরামর্শ করিয়া রাম-কৃষ্ণ তদুপযোগী আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন। খুব উৎসাহের সহিত সব আয়োজন হইতে লাগিল। মদ্যমাংসের ব্যবস্থাটা খুবই হইল।

প্রভাসে পৌঁছিয়া সকলেই বেশ শান্তভাব প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু ক্রমে যথেচ্ছা মদ খাইয়া যত মাতাল হইতে লাগিলেন, ততই অদম্য হইয়া উঠিলেন। প্রথম

হাসি তামাসা, তার পর কলহ, হাতাহাতি ক্রমে মারামারি আরম্ভ হইল। রাম-কৃষ্ণ অস্ত্রধারণ করিলেন,—ভাবিলেন উঁহারা ভয়ে নিরস্ত হইবে। তাহাতে তাঁহারা আরও ক্ষেপিয়া উঠিয়া যে যাহাকে পারিলেন হত্যা করিতে লাগিলেন। আর একটি কুরুক্ষেত্রের অভিনয় হইয়া গেল। সকলেই ভীষণ রূপে আহত বা নিহত হইলে যুদ্ধ থামিল। রাম-কৃষ্ণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সব দেখিলেন।

কোমলহৃদয় রাম আর সহ্য করিতে পারিলেন না, সেই স্থানেই যোগাসনে বসিয়া সমাধি অবলম্বনে গোলকে চলিয়া গেলেন।

যদুবংশের বৃদ্ধ রমণী ও শিশুদিগকে রক্ষার ভার দূতমুখে অর্জ্জুনকে দিয়া শ্রীকৃষ্ণও অগ্রজের অনুসরণ করিলেন।

কৃষ্ণভক্ত বেদব্যাস হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা ও প্রচারের জন্য বহু গ্রন্থ লিখিলেন, শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের আদর্শে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ভারতে প্রচার করিলেন। মানুষ শান্তি লাভ করিল।

বুদ্ধ চরিত।

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়-হৃদয়-দর্শিত-পশুঘাতম্।
কেশব ধৃত বুদ্ধ-শরীর
জয় জগদীশ হরে॥

১

রাম-কৃষ্ণের জীবনের আদর্শে ভারতের খুব উন্নতি হইয়াছিল। মানুষ বুঝিয়াছিল যে, ভগবান্ লাভই জীবনের উদ্দেশ্য; তাহাতেই শান্তি, তাহাতেই সুখ। তাই জীবনের সকল কর্ম্মই তাহারা ভগবান্ লাভের জন্য করিত। এইরূপে দেশ হইতে পাপ চলিয়া গেল, পূর্ণশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

শান্তি পাইয়া মানুষ ক্রমে আরামপ্রিয় হইতে লাগিল। ভগবান্ ও ধর্ম্ম কেবল কথার কথা; মান সম্ভ্রম, সংসারের সুখই জীবনের সার, এই ভাবই প্রবল হইতে লাগিল। ধর্ম্ম কর্ম্ম গৌরবের বস্তু হইল, তাহার উদ্দেশ্য যে শান্তি তাহা লোকে ভুলিল। নিজ নিজ বর্ণের গৌরব বাড়াইবার জন্যই লোকে ধর্ম্ম আচরণ করিতে লাগিল।

রাজা রাজড়া কত ব্যয়সাধ্য যাগযজ্ঞ করেন, কিন্তু

তাহার উদ্দেশ্য মান যশ। যোগিগণ, ব্রাহ্মণগণ কত কষ্টসাধ্য তপস্যা করিয়া শরীর পাত করেন; কিন্তু সম্মান, পূজালাভ, শিষ্য করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। জাতের গৌরব, সাংসারিক উন্নতি লইয়া মানুষ বিব্রত হইল। দেশ হইতে ভগবান্ গেলেন, ধর্ম্মের স্থান লোকাচার গ্রহণ করিল। মানুষের প্রাণে শান্তিসুখ রহিল না। জীবন ভগবদ্‌ভক্তিহীন শ্মশানে পরিণত হইল, তাহাতে বাসনার অনল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

২

কপিলবাস্তু নামক নগরে শুদ্ধোধন নামে এক রাজা ছিলেন। অনেক বয়সে তাঁহার একটি সন্তান জন্মে। জ্যোতিষিগণ গণনা করিয়া বলিলেন, 'এ ছেলে সংসারে থাকিলে রাজচক্রবর্ত্তী, সন্ন্যাসী হইলে জগদ্‌গুরু হইবে।' তাঁহার নাম রাখা হইল সিদ্ধার্থ। খুব সুশ্রী, বুদ্ধিমান, স্থির ধীর বলিয়া সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। বালকসুলভ চপলতা তাঁহার ছিল না, এমন কি খেলা করিতেও তিনি ভালবাসিতেন না। যতই বয়স বাড়িতে লাগিল, ততই তাঁহার গাম্ভীর্য্যও বাড়িতে লাগিল। রাজা শুদ্ধোধন সর্ব্বদাই শঙ্কিত, পাছে ছেলে সন্ন্যাসী হয়। তাই তিনি সিদ্ধার্থকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিবার চেষ্টা করিতেন।

বাল্যকালেই তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বজীবের প্রতি সমান দয়ার ভাব দেখা যাইত। একদিন দেবদত্ত নামে একটি শাক্যবালক এক বন্য হংসের উপর তীর নিক্ষেপ করে। তীরের আঘাতে হাঁসটি আকাশ হইতে সিদ্ধার্থের নিকটে পতিত হইল। সিদ্ধার্থ হাঁসটিকে সযত্নে কোলে তুলিয়া লইয়া তীর খুলিয়া তাহাকে সুস্থ করিলেন। দেবদত্ত তাহার শিকারটি লইয়া যাইবার জন্য ছুটিয়া আসিল, কিন্তু সিদ্ধার্থ কিছুতেই হাঁস দিতে সম্মত হইলেন না। উভয়ে এই লইয়া বিবাদ বাধিল। তাঁহারা মীমাংসার জন্য বৃদ্ধদের নিকট গেলে বৃদ্ধগণ বলিলেন, 'যে, কোনও প্রাণীর প্রাণ রক্ষা করে, প্রাণটি তারই হয়।'

কপিলবাস্তু নগরে এক কৃষি-উৎসব ছিল। এই উপলক্ষে রাজা, মন্ত্রী প্রভৃতি সকলেই লাঙ্গল দিয়া ভূমি কর্ষণ করিতেন। তাহাতে মাটীর ভিতর হইতে কৃমিকীট সকল বাহির হইয়া পড়িত; লোকের পদতলে পড়িয়া কতক মরিত, বাকী সব পক্ষীরা ধরিয়া খাইত। সিদ্ধার্থ জীবের এই দারুণ কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া এই প্রথা তুলিয়া দিবার জন্য পিতাকে অনুনয় বিনয় করিলেন।

গোপা নাম্নী এক রূপগুণবতী রমণীকে সিদ্ধার্থ বিবাহ করেন। বৈরাগ্য চিন্তায় পূর্ণ তাঁহার মন আমোদে মগ্ন রাখিবার জন্য রাজা এক প্রমোদ উদ্যান নির্ম্মাণ করেন,

তথায় প্রত্যহ নৃত্যগীত হইত। সিদ্ধার্থ তাহাতে যোগ দিতেন বটে, কিন্তু অন্য লোকের ন্যায় আমোদ অনুভব করিতেন না।

৩

মানুষের দুঃখের অন্ত নাই, এক দুঃখ দূর করিলে আর এক দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। জীবের দুঃখ দেখিলেই সিদ্ধার্থের মন গলিয়া যায়, ইচ্ছা হয় প্রাণ দিয়াও যদি তিনি সেই দুঃখ মোচন করিতে পারিতেন। একদিন নগর ভ্রমণ করিতে গিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন একব্যক্তি রোগের যন্ত্রণায় বড় কষ্ট পাইতেছে। অমনি তাঁহার চিন্তাশীল মনে নানা আন্দোলন উপস্থিত হইল, আর ভ্রমণ করা হইল না।

আর একদিন এক বৃদ্ধের দুরবস্থা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। মানবদেহের এই নিশ্চিত পরিণামের বিষয় ভাবিয়া তিনি অধীর হইলেন।

অন্য এক দিনের একটি দৃশ্য তাঁহাকে আরও চঞ্চল করিয়া তুলিল। তিনি দেখিলেন, এক মৃত ব্যক্তিকে দাহ করিবার জন্য শ্মশানে আনা হইয়াছে, তাহার স্ত্রীপুত্র ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেছে। এই দৃশ্য সিদ্ধার্থের মনে মহা

বৈরাগ্যের সঞ্চার করিল। হায়, এমন অনিত্য, দুঃখময় জীবন লইয়া আমরা ভুলিয়া আছি! এই ব্যাধি-জরা-মরণ হইতে উদ্ধারের কি কোনও উপায় নাই? যদি না থাকে তবে এই জীবনের মূল্য কি? ভাবিয়া ভাবিয়া সিদ্ধার্থ এই চিন্তার কোনও কূল কিনারা করিতে পারিলেন না।

একদিন এক শান্তমূর্ত্তি সন্ন্যাসীর নির্ব্বিকার ভাব দেখিয়া তাঁহার মনে এক নূতন চিন্তার উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, এইরূপে আমিও সন্ন্যাসী হইয়া তপস্যা করিয়া দেখিব জরা-ব্যাধি-মরণের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের কোনও উপায় আছে কি-না। তিনি পিতার নিকট নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। রাজা এই কথা শুনিয়া বড়ই বিচলিত হইলেন, কোনও যুক্তিতেই তিনি পুত্রের সন্ন্যাস অনুমোদন করিলেন না; বরং যাহাতে অজ্ঞাতসারে সিদ্ধার্থ পলায়ন না করেন সেইজন্য কড়া পাহারা নিযুক্ত করিলেন।

এই সময়ে গোপা এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন। সিদ্ধার্থ দেখিলেন, ক্রমেই তিনি সংসারে জড়াইয়া পড়িতেছেন; অতএব আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে। এই ভাবিয়া একদিন গভীর রাত্রে তিনি রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

৪

সিদ্ধার্থ ত্যাগীর বেশে তপস্বীদের নিকট গিয়া যোগশিক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন লোকে নানারূপ কঠোর তপস্যা করিত এবং কোনওরূপ সামান্য অনুভূতি হইলেই সিদ্ধি হইয়াছে ভাবিয়া লোকের নিকট তাহা প্রচার করিত। সিদ্ধার্থ এই শ্রেণীর অনেক যোগীর শিষ্যত্ব করিয়া তাহাদের ধর্ম্মমতে সিদ্ধিলাভ করিলেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন, এই সব অনুভূতি মানুষকে জরা-মরণের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে না। তাহার মনের অশান্তি আরও বাড়িয়া গেল।

নানাস্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত ও নিরাশ হইয়া সিদ্ধার্থ স্থির করিলেন, নিজে ধ্যান তপস্যা করিয়া জরা-মরণ নিবারণের উপায় জানিবার চেষ্টা করিবেন। তাই তিনি গয়ার নিকট নৈরঞ্জনা নদীতীরে উরুবিল্বগ্রামে একটি মনোহর স্থানে যোগাসন করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। পাঁচজন সাধক, তাঁহার তপস্যা ও তেজস্বিতায় মুগ্ধ হইয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, এখন তাঁহারা সিদ্ধার্থের সেবা করিতে লাগিলেন।

সিদ্ধার্থ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দিবানিশি একাসনে ধ্যান করিতে লাগিলেন। উপবাসে তাঁহার শরীর এমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িল যে, একদিন তিনি স্নান

করিয়া নদী হইতে তীরে উঠিবার সময় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শিষ্যগণ ভাবিলেন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে তিনি ভাবিলেন এইরূপ কঠোরভাবে থাকিয়া শরীর নষ্ট করিলে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। তাই তিনি আবার পানাহার করিতে লাগিলেন। তখনকার লোকের ধারণা ছিল পানাহারের কঠোরতাই সাধনা। সিদ্ধার্থ সেই কঠোরতা ত্যাগ করিলেন দেখিয়া শিষ্যগণ ভাবিলেন ইঁহার পতন হইয়াছে, তাই তাঁহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

সিদ্ধার্থের দেহ সুস্থ ও সবল হইল। ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার মন নির্ব্বাণ-সাগরে মিলাইয়া গেল, তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন। আনন্দ ও শান্তিতে তাঁহার প্রাণ ভরিয়া উঠিল।

সিদ্ধার্থ আশৈশব জীবের দুঃখে কাতর ছিলেন। বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া দুঃখমোচনের উপায় জানিতে পারিলেন। কিন্তু মুক্তির কথা নির্ব্বাণের কথা কাহাকে বলিবেন? সাধারণ লোক ত এইসব কথা বুঝিতে পারিবে না। সেই পাঁচজন শিষ্যের কথা তাঁহার মনে পড়িল। খুঁজিতে খুঁজিতে কাশীর নিকট সারনাথে গিয়া তিনি তাঁহাদিগকে পাইলেন। তাঁহার উপদেশে নির্ব্বাণ লাভ করিয়া শিষ্যগণ কৃতার্থ হইল।

ফুল ফুটিলে ভ্রমরের অভাব হয় না। শত শত লোক ধর্ম্মশিক্ষা লাভের জন্য ছুটিয়া আসিতে লাগিল। অনেকে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে লাগিল।

শুদ্ধোধন পুত্রের গৌরবের কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি বুদ্ধদেবকে কপিলবাস্তুতে আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। বুদ্ধদেব আসিলে নগরের লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। শুদ্ধোধন, গোপা প্রভৃতি সকলে নির্ব্বাণ ধর্ম্মের উপদেশ লাভ করিয়া দুঃখ-সুখের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। শাক্যবংশের অনেক বালক ও যুবক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বুদ্ধদেবের অনুগমন করিল, এমন কি, বুদ্ধদেবের শিশুপুত্র রাহুলও সন্ন্যাসী হইল।

বুদ্ধদেব উত্তরভারতের সর্ব্বত্র নির্ব্বাণধর্ম্মের উপদেশ দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কঠোর তপস্যা করিয়াও যে সাধকগণ অভীষ্ট লাভ করিতে পারিতেছিলেন না বুদ্ধদেবের কৃপায় তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিলেন। সংসারের জ্বালায় কতশত লোক জ্বলিয়া মরিতেছিলেন বুদ্ধদেবের উপদেশে তাঁহাদের শান্তি হইল। পতিত ঘৃণিত বলিয়া যাহারা সমাজে হেয় ছিল, বুদ্ধদেব তাহাদিগকে শিষ্য করিয়া উদ্ধার করিলেন। ভারতে আবার ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠিল মানুষের মন শান্তি লাভ করিল।

আশী বৎসর বয়সে বুদ্ধদেব মহানির্ব্বাণ লাভ করেন

কল্কি চরিত।

ম্লেচ্ছনিবহ-নিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।
কেশব ধৃত কল্কি-শরীর
জয় জগদীশ হরে॥

১

বুদ্ধদেবের পর মানুষ আবার ধর্ম্মের কথা ভুলিয়া গেল। তখন শঙ্কররূপে ভগবান্ মানবদেহ ধারণ করিয়া জীবকে ধর্ম্মশিক্ষা দিলেন। এইরূপে মানবের মঙ্গলের জন্য রামানুজ-চৈতন্য-রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু দশাবতার মধ্যে বুদ্ধদেবের পর কল্কি অবতারের নামই উল্লেখ করা হয়। কল্কি মানে যিনি আসিবেন [কল্ (গমন, আগমন) + কি]।

কলিযুগের শেষভাগে মানুষ জ্ঞানহীন হইয়া ভগবানকে ভুলিয়া যাইবে। পাপের ফলে তাহাদের আকার ও আয়ু অত্যন্ত হ্রস্ব হইবে। ধূর্ত্ততা কপটাচার প্রভৃতি সর্ববিধ নীচতা হইবে তাহাদের স্বভাব, সুদখোর ব্রাহ্মণের মান্য হইবে, শঠ সন্ন্যাসী সাজিয়া মানুষকে ভুলাইবে। ভাই বন্ধুকে লোকে পর ভাবিবে, কিন্তু শ্যালক সম্বন্ধীকে

পরমাত্মীয় বলিয়া জানিবে। কলহ বিবাদ হইবে তাহাদের নিত্যকর্ম্ম। কেশ বিন্যাস ও পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্য হইবে সভ্যতা। মোট কথা, মানুষের মনে বুদ্ধির লেশমাত্র রহিবে না।

দানব-প্রকৃতির লোক, ছলে বলে দেশের রাজা হইয়া প্রজার অর্থ শোষণ করিবে। যত দুষ্ট লোক, রাজার অনুগত হইয়া লোকের হিত করিবার ছলে নিজ স্বার্থ সাধন করিবে। রোগ, মহামারী, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপদ্রবে অনবরত লোকক্ষয় হইবে।

শম্ভল নামক গ্রামে বিষ্ণুযশা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিবেন। তিনি সুমতি নাম্নী নারীকে বিবাহ করিবেন। তাঁহারা উভয়ে ধর্ম্ম কর্ম্মে দিন যাপন করিবেন। ভগবান্ কল্কি পুত্ররূপে তাঁহাদের গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন। কল্কি অল্প বয়সেই বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করিয়া মহা পণ্ডিত হইয়া উঠিবেন। পরে, জীবের দুঃখে কাতর হইয়া, মহাদেবের উপাসনা করিয়া তিনি অস্ত্রবিদ্যা লাভ করিবেন।

সেই দেশের রাজা বিশাখযূপ কল্কিদেবের মাহাত্ম্য অবগত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করতঃ তাঁহার উপদেশ অনুসারে রাজ্য শাসন করিবেন। কল্কিদেবের কৃপায় তাঁহার রাজ্যের লোক ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া উঠিবে।

২

সিংহল দ্বীপে বৃহদ্রথ নামে এক রাজা হইবেন। তাঁহার মহিষী কৌমুদীর গর্ভে এক অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী কন্যা জন্মিবে। তাঁহার নাম হইল পদ্মা। পদ্মা বাল্যকাল হইতে শ্রীহরির পরমভক্ত হইবেন এবং তাঁহাকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য মহাদেবের আরাধনা করিবেন। হরপার্ব্বতী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে এই বর দিবেন যে, 'তিনি শ্রীহরিকে পতিরূপে পাইবেন এবং শ্রীহরি ব্যতীত অন্য কোনও পুরুষ পত্নীভাবে তাহার দিকে তাকাইলে সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ নারীরূপ ধারণ করিবে।'

পদ্মাদেবীর বিবাহের বয়স হইলে, রাজা বৃহদ্রথ কন্যার বিবাহের জন্য স্বয়ম্বর-সভা আহ্বান করিবেন। রাজগণ অসামান্য রূপবতী পদ্মার রূপ দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে পাইবার বাসনা করায় তৎক্ষণাৎ পদ্মার ন্যায় যুবতী হইয়া পড়িবেন। লজ্জায় তাঁহারা আর নিজ রাজ্যে ফিরিয়া না গিয়া পদ্মাদেবীর সখীরূপে তাঁহার সঙ্গে বাস করিবেন। কল্কিদেব এই সংবাদ অবগত হইয়া অশ্বারোহণে সিংহল দ্বীপে যাইবেন। পদ্মাদেবী, জলবিহার কালে দর্শনমাত্র চিনিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইবেন। বৃহদ্রথ তাহা জানিতে পারিয়া বহু

অর্থাদিসহ কল্কিদেবকে স্বীয় কন্যা সমর্পণ করিবেন। যে সব রাজা নারীরূপ পাইয়া ছিলেন, কল্কিদেবের দর্শনমাত্র তাঁহারা পূর্ব্বরূপ পাইয়া কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন।

এদিকে, দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা শম্ভলগ্রামে এক অপূর্ব্ব পুরী নির্ম্মাণ করিবেন। কল্কিদেব পত্নী ও ধনরত্ন হস্তী অশ্বাদিসহ স্বদেশে ফিরিয়া সেই পুরীতে বাস করিবেন। কিছুদিন পরে, জয় বিজয় নামে মহা বলশালী তাঁহার দুইটি পুত্র জন্মিবে।

৩

বিষ্ণুযশা এক অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার সঙ্কল্প করিবেন। পুত্র পিতার ইচ্ছা পূরণের জন্য দিগ্বিজয় করিতে বাহির হইবেন। কারণ রাজচক্রবর্ত্তী না হইলে অশ্বমেধ করা যায় না।

ভগবান্ কল্কি প্রথমে কীকটদেশে বৌদ্ধ নামধারী অসুরপ্রকৃতি লোকের রাজ্য আক্রমণ করিবেন। বৌদ্ধগণ সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নানা মায়া অবলম্বন করিবে, কিন্তু কল্কিদেব তাহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিবেন। অতঃপর তাহারা বহু ম্লেচ্ছ সেনা সংগ্রহ করিয়া কল্কি-সৈন্যকে আক্রমণ করিবে। ভয়ানক যুদ্ধের পর বৌদ্ধ ও

ম্লেচ্ছগণ নিহত হইবে। তাহাদের রুধিরে নদী বহিয়া যাইবে, রথ হস্তী অশ্ব তাহাতে কুম্ভীরের ন্যায় ভাসিবে, মৃতদেহে পর্ব্বতের সৃষ্টি হইবে।

পতিপুত্রের নিধনে ক্রোধান্ধ হইয়া বৌদ্ধ ও ম্লেচ্ছ রমণীগণ, যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইয়া কল্কি-সৈন্যকে আক্রমণ করিবে। স্ত্রীলোক মারিলে পাপ ও অপযশ, যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত করিলেও গৌরব নাই, এই ভাবিয়া কল্কিদেব এক মায়া অবলম্বন করিবেন। রমণীগণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে তাহা স্তম্ভিত হইবে, বাণাদি ফিরিয়া ফিরিয়া তাহাদের হাতে আসিবে। ইহাতে রমণীগণের মানসিক ভাব পরিবর্ত্তিত হইবে। ভগবান্ বোধ করিয়া তাহারা কল্কি-দেবের শরণ লইবে। তিনি তাহাদিগকে জ্ঞান উপদেশ দিয়া মুক্তি প্রদান করিবেন।

এই সময় চক্রতীর্থে বালখিল্য নামক অতি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি ঋষিগণ কল্কিদেবের নিকট নিবেদন করিবেন যে, কুথোদরী নাম্নী এক মায়াবিনী রাক্ষসীর উপদ্রবে তাঁহাদের তপস্যার বড়ই বিঘ্ন হইতেছে। কল্কিদেব রাক্ষসীকে শাসন করিতে সৈন্যসহ হিমালয় প্রদেশে যাইবেন।

কুথোদরী হিমালয় পর্ব্বতে মাথা ও নিষধ পর্ব্বতে পা রাখিয়া বহু যোজন ব্যাপিয়া শুইয়া, পুত্র বিকঞ্জনকে স্তন পান করাইবে। স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইয়া একটি

নদীর সৃষ্টি করিবে। রাক্ষসীর নিশ্বাস-পবনের বেগে বন্য হস্তী সকল দূরে নিক্ষিপ্ত হইবে, গহ্বর মনে করিয়া সিংহগণ তাহার কর্ণকুহরে ও হরিণগণ লোমকূপে বাস করিবে। কল্কিদেবের সৈন্যগণ সেই অদ্ভুত রাক্ষসীকে দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইবে। কল্কিদেব তাহাকে আক্রমণ করিলে সে তাঁহাকে সসৈন্যে গিলিয়া ফেলিবে। তিনি খড়্গ ধারণ করিয়া রাক্ষসীর উদর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া বাহির হইবেন। দিগ্‌দেশ রুধিরে প্লাবিত করিয়া বিরাট পর্ব্বতমালার ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া কুথোদরী প্রাণত্যাগ করিবে।

মরু ও দেবাপি নামক দুইজন ভক্ত রাজা কল্কিদেবের শিষ্য হইবেন। বিশাখযূপ, মরু ও দেবাপি প্রভৃতি সকলের সম্মিলিত বিরাট সৈন্যবাহিনী সহ কল্কিদেব (বিশসন) বিণসন নামক প্রদেশ আক্রমণ করিবেন। পূর্ব্বের ন্যায় ভয়ানক যুদ্ধের পর অধর্ম্মচারিগণ বিনষ্ট হইবে। কোক ও বিকোক নামক দুইজন মায়াবী নানা মায়া অবলম্বন করিবে কিন্তু কল্কিদেব তাহাদের মায়া ব্যর্থ করিয়া তাহাদিগকে নিধন করিবেন।

অতঃপর কল্কিদেব ভল্লাট নগর আক্রমণ করিবেন। ভল্লাটের রাজা মহা যোদ্ধা ও হরিভক্ত শশিধ্বজ ও তাঁহার ভক্তিমতী স্ত্রী সুশান্তা যোগবলে কল্কিদেবকে চিনিতে পারিবেন। শত্রুভাব পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরির চরণে

শরণ লইবার জন্য সুশান্তা পতিকে অনেক প্রকারে বুঝাইবেন, কিন্তু শশিধ্বজ কিছুতেই সম্মত না হইয়া পুত্রাদি সমুদয় আত্মীয় ও সৈন্যসহ কল্কিদেবকে আক্রমণ করিবেন। শশিধ্বজের বীরত্বে বিশাখযূপাদি সকলেই পরাজিত হইবেন। কল্কিদেব শশিধ্বজের অস্ত্রাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে রাজা তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া রাজপুরীতে লইয়া যাইবেন।

সুশান্তা ও তাঁহার সখীগণ শ্রীহরিকে পাইয়া আনন্দে, তাঁহাকে ঘেরিয়া, নৃত্যগীত করিতে থাকিবেন। কল্কিদেব চেতনা পাইয়া ইঁহাদের ভক্তিভাবদর্শনে প্রীত হইয়া আত্মসমর্পণ করিবেন। শশিধ্বজ স্বীয় কন্যা রমাকে কল্কিদেবের করে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে জামাতৃপদে বরণ করিবেন। এই উপলক্ষে সেই বিরাট সৈন্য-সংঘ মধ্যে মহামহোৎসব হইবে।

ভগবান্ কল্কি ভারতের সমুদয় অত্যাচারী অসুরস্বভাব রাজগণকে সংহার করিবেন। দুষ্ট লোক সকল তাঁহার ভয়ে সৎপথ অবলম্বন করিবে। দিগ্‌বিজয় করিয়া তিনি সমস্ত ভারতের রাজচক্রবর্ত্তী হইবেন এবং পিতার সংকল্পিত অশ্বমেধ ও অন্যান্য অনেক যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া বৈদিকধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিবেন। তাঁহার অসাধারণ কার্য্যাবলী দেখিয়া এবং তাঁহার শাসনাধীনে থাকায় লোকে

অহরহঃ তাঁহারই চরিত্র চিন্তা করিয়া পবিত্র হইয়া যাইবে। তাঁহার আদর্শে সর্ব্বদা ধর্ম্মকর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া তাহারা পরম শান্তি লাভ করিবে। যথাসময়ে সুবৃষ্টি হইবে। ভূমি উর্ব্বরা হওয়াতে প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মিবে। রোগ শোক কিছুই থাকিবে না।

এইরূপে সত্যযুগের পুনরাবির্ভাব হইলে কল্কিদেব অবতার দেহ ত্যাগ করিয়া গোলকে বিহার করিবেন।

(সমাপ্ত)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য্য প্রণীত—তৃতীয় সংস্করণ মূল্য ।• আনা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংস দেবের জীবনী। বালক বালিকাদের জন্য সরল ভাষায় লিখিত। পরমহংসদেবের জীবনের সকল ঘটনাই ইহাতে সুন্দর ভাবে বর্ণিত আছে। বড় অক্ষরে এণ্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা।

উক্ত পুস্তকের সমগ্র আয় সিষ্টার নিবেদিতার বালিকা-বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ নিয়োজিত হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ৩য় সংস্করণ। সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত লিখিতে ইন্দ্রদয়াল বাবু সিদ্ধ-হস্ত। যাঁহারা তৎপ্রণীত 'শ্রীরামকৃষ্ণ' পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহা বিশেষ অবগত। এই পুস্তিকার মধ্যে পাঁচ অধ্যায়ে স্বামিজীর জীবনের প্রধান প্রধান সকল কথাই গুছাইয়া বলা হইয়াছে। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।